জগবন্ধু

(ধর্ম্মমূলক উপন্যাস)

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩২৯

মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।
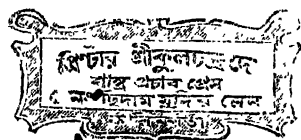
নিবেদন

একজন মহাপুরুষের মুখে তাঁহার নিজ জীবনী সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া ছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, ইহা আদৌ কল্পনা সম্ভূত নহে। দুই একটি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু যোগীরা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ক্রিয়া যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয় না, এই গ্রন্থে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের শেষ না হইলে যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে ও ঋষিদের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে কুমার জগবন্ধু স্বামীর বর্ণনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাওয়া আসা কর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত করিতেই হইবে, কোন মতে অন্যথা হইবে না। পূর্ব্ব জন্মের গুরুকেও শিষ্যের নিমিত্ত বারংবার যাওয়া আসা করিতে হয় বা তাহার অপেক্ষায় ভবে থাকিতে হয়।

থিয়সফিষ্টরা যোগের ক্রিয়া লইয়া থাকেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে অনেকে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হিন্দুশাস্ত্র মতে কার্য্য করিতে চাহেন না, কিন্তু ইংরাজেরা যদি সেই কার্য্য করেন তাহা হইলে দ্বিধাশূন্য হইয়া তাহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। যাহা হউক, কাহার উপর আমি কটাক্ষ করি নাই। কেহ যেন, বিরুদ্ধভাবে গ্রহণ না করেন। আমি লিখিয়া খালাস। সাধারণের যদি ভাল লাগে তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, ইতি।

জামালপুর		সেবক
১লা শ্রাবণ, ১৩২৯	}	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।

জগবন্ধু

প্রথম অঙ্ক

আমার নিবাস ভবানীপুরে ছিল (কলিকাতা)। আমার পিতা ভবানীপুরের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তাঁহার পসার ও নাম ডাক ছিল। মাসে দুই তিন সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন। আমরা দুই ভাই, আমি কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ আইন পরীক্ষা দিয়ে পিতার সহিত প্র্যাক্‌টিস কর্ত্তেন। আমিও সর্ব্বোচ্চ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেছিলাম। কিছুদিন কলিকাতায় থাকার পর, আমাকে দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে ১৮৭০ সালে বদলি করা হয়েছিল। তখন আমার বয়স ২০ বৎসর। আমার তখনও বিবাহ হয় নাই। আমি বিবাহ না করায়, পিতামাতা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার নাম জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম নাই বললাম, তাতে ক্ষতি কি?

দানাপুরে যথাসময়ে এসে কার্য্য লইলাম। সিভিল সার্জ্জন বেশ ভদ্র

ও অমায়িক লোক ছিলেন। যে কয়েক মাস তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রেছিলাম সে কয়েক মাস আমার সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করেছিলেন ও অনেক কেস্ আমায় দিতেন। দানাপুরে আমার অনেকগুলি বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলিলেই যে প্রাণের বন্ধু, অর্থাৎ 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুশঙ্কটে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ॥' এরকম বন্ধু নয়, তবে আমার বাসায় এসে গল্পগুজব, তাস পাশা খেলা ও সন্ধ্যার পর দু এক গ্লাস হুইস্কি, মটন চপ, ষ্টু, গ্র্যাভি, কাট্‌লেট্, পোলাও ইত্যাদি খেয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতেন। আমারও পেছটান না থাকায় ও বাড়ীতে টাকা পাঠাতে না হওয়ায়, আমি যা উপায় কত্তাম প্রায় চার পাঁচশ টাকা সমস্তই খরচ করে ফেলতাম। আমার অনেকগুলি চাকর বাকর ছিল, গাড়ী ঘোড়া ছিল। যে সময়ের কথা বল্‌ছি সে সময়ে বাইসিকেল বা মটর গাড়ীর আমদানী হয় নি। সরকার বাহাদুরের বাড়ীতেই থাকতাম, ভাড়া দিতে হত না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

এই রকম ক'রে চার পাঁচ মাস বেশ ফুর্ত্তি ক'রে কাটিয়েছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে সুখ না থাকলে ভূতে কিলোয়, আমায় ভূতে ধর্‌ল। একদিন সন্ধ্যার পর রোগী দেখে ফিরে আসবার সময় পথের ধারে গাছতলায় একজন জটাজুটধারী দিগম্বর সন্ন্যাসীকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছিলাম, কিন্তু গ্রাহ্য না করে চলে গেলাম, কারণ তখন আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, যে রোগীটিকে দেখেছিলাম সে দিন তাহার অবস্থা ভাল ছিল না। ভাবতে ভাবতে যেন তাঁকে দেখতে পাই নাই এই ভাবে

চলে গেলাম। তার পর দিন ঠিক সেই সময়ে, সেই রোগীটিকে দেখে ফিরে আসছি, দেখলাম সেই গাছতলায় সেই সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়ে আছেন ও আমায় দেখে হাতছানি দিয়ে ডেকে বল্লেন "বেটা, ভুখা হুঁ, কুছ্ ভোজন দেও।" আমি বল্লাম "যদি দয়া করে আমার বাসায় আসেন, তা হলে যা খেতে ইচ্ছে করবেন দিতে পারব।" তিনি "চল্ বেটা" বলে একটু মুচ্‌কি হেসে আমার সঙ্গে বাসায় এলেন।

বাসায় এসে দেখলাম—বন্ধুরা উপস্থিত হয়ে পান তামাকের সদ্ব্যবহার কচ্চেন। আমায় একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আস্‌তে দেখে ঠাট্টা কত্তে লাগলেন। একজন বল্লেন "ডাক্তার! সাধু সন্ন্যাসী ধরে বেড়াচ্ছ, ব্যাপার কি হে?" আর একজন বল্লেন "এইবার ডাক্তার হয় ত সন্ন্যাসী হবে।" আর একজন একটু রং চড়িয়ে, মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন "এ চিজটি কোথায় পেলে বাবা?" যদিও আমার সন্ন্যাসী ফকীরের উপর তখন তত আস্থা ছিল না, তবুও বড় বিরক্ত হয়ে বললাম "আপনাদের অত ঠাট্টা তামাসা করবার কারণ ত কিছুই নেই। বাবা অভুক্ত, কিছু খেতে চাইলেন, তাই সঙ্গে করে এনেছি।" চাকরকে ডেকে পা ধোবার জল ও একখানা আসন দিতে বললাম, কিন্তু তিনি আসনে না বসে মাটিতেই বসলেন। আমি বললাম "বাবা! মাটিতে বসলেন কেন? আসনে বসুন না।" তিনি হেসে বললেন "বাবা, মাট্টি মাট্টিমে মিলেগা, ম্যাঁয় সাফা কাপড়া নেহি পেহরা হুঁ।"

আমি। আপনি কি আহার করবেন?

সন্ন্যাসী। যো কুছ্ তুম খিলাওগে।

আমি। যো আপ্ হুকুম করেগা তাই আনায়কে দেগা। তখন পর্য্যন্ত হিন্দী বুলি আয়ত্ত করতে পারি নাই।

সন্ন্যাসী। মাঙ্গানেকা কুছ্ জরুরত নেহি, তুম যো কুছ্ খাওগে ম্যাঁয় ভি ওহি পাঁওগা।

আমি। আমি লুচি মাংস খাব, আপ কি খাবেন?

সন্ন্যাসী। বহুৎ আচ্ছা।

আমি "বেশ" বলে ঠাকুরকে অর্থাৎ রাঁধুনী বামুনকে খানকতক বেশী লুচি ভাজতে বলে দিলাম। বাবাজি সেই স্থানে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন, আমরা তাস পিটতে লাগলাম, রাত্রি নটার পর খেলা বন্ধ করে সুরাদেবীর আরাধনা করতে বসলাম। ঠাকুর চপ কাটলেট ইত্যাদি দিয়া গেল। একটু নেশা জমে এলে আমাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস্ কল্লেন "বাবা, একটু কারণ টারণ হবে না?" সন্ন্যাসী হেসে বললেন "তোম লোগ ম্যাঁয় পিনেসে অর্পর খুস হও, ম্যাঁয় পি সকতা হুঁ।" সে লোকটি এক টম্বলার সুরা সোডা দিয়ে তাঁর হাতে দিলেন. তিনিও "জয় তারা" বলে এক চুমুকে সমস্তটা পান করে ফেললেন। আমাদেরও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাকুরকে খাবার দিতে বললাম। বন্ধুরা সকলে বাড়ী চলে গেলেন। আমরা একসঙ্গে কাছাকাছি বসেছিলাম। আহার কত্তে কত্তে জিজ্ঞেস কল্লাম "বাবা, আপনার আশ্রম কোথায়?"

সন্ন্যাসী। আমি বাবা পাহাড়ে বনে জঙ্গলে থাকি। গঙ্গাস্নান করবার জন্যে আর একটু কাজ ছিল বলে নেমেছি?

আমি। বাবা যে বেশ বাঙ্গলা বলেন। আপনি কি বাঙ্গালি?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ বাবা! আমি বাঙ্গালী।

আমি। কতদিন এ আশ্রমে এসেছেন?

সন্ন্যাসী। প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর।

আমি। এতদিন! আপনাকে দেখলে ষাট বছরের বেশী বলে বোধ হয় না।

সন্ন্যাসী। ষাটের দেড়া বয়স হয়েছে।

আমি। বটে! আচ্ছা বাবা আমার ভবিষ্যৎটা বলে দেবেন?

সন্ন্যাসী। তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল!

আমি। বুঝতে পারলাম না।

সন্ন্যাসী। জগদম্বা তোমায় শ্রীচরণে স্থান দেবেন।

আমি। পাহাড়ে বনে ত ফলমূল খান, না আর কিছু খাবার খান?

সন্ন্যাসী। যে দিন মা যা দেন তাই খাই।

আমি। মা কি হাতে করে দিয়ে যান?

সন্ন্যাসী। না—আসেন না বটে, তবে যখন যা খাবার ইচ্ছে হয়, জুটে যায়। এই দেখ না, আজ মদ মাংস লুচি খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, ঠিক জুটে গেল।

আমি। মা কি দিলেন?

সন্ন্যাসী। মা দিলেন না ত কে দিলে? তুমি ত নিমিত্ত মাত্র। মা দিচ্ছেন তাইত খাচ্ছ, নইলে কোথায় পেতে?

আমি। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও কি মা দেবেন?

সন্ন্যাসী। নিশ্চয়, যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, অন্নপূর্ণা যোগাবেনই।

আমি। আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম অর্থাৎ গতর না খাটালে খেতে পাওয়া যায় না।

সন্ন্যাসী। ভুল—বাবা ভুল। এই দেখ না আমিই তার দৃষ্টান্ত। আমি ত গতর খাটাই না, তবু যখন যা ইচ্ছে হয় খেতে পাই।

আমি। আপনার কথা আলাদা।

সন্ন্যাসী। কেন—আমার কথা আলাদা কেন? আমিও হাত পা ওয়ালা মানুষ, তুমিও তাই।

আমি। তা হলেও আপনার সাধনবল আছে, আমার ত তা নেই।

সন্ন্যাসী। নাই থাক, যখন আমাদের তিনি পাঠিয়েছেন তখন খেতে দিতে বাধ্য, তা সুখেই হোক বা কষ্টেই হোক। দেখ আমরা ভবে আসবার আগে তিনি তার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মাতৃস্তনে দুধ।

"আমি। আমার ধারণা নেচার, (nature) তা না হলে যাদের ছেলে হয়নি তাদের স্তনে দুধ হয় না কেন?

সন্ন্যাসী। তা হলেই দেখ ছেলে গর্ভে জন্মাবামাত্র তার খাবার আগে থেকেই যোগান রইল। বেশ নেচার কাকে বল?

সন্ন্যাসী। স্বভাব, যা বরাবর হয়ে আসছে, পরেও হবে।

আমি। ভাল—স্বভাব, স্ব অর্থে স্বীয়, নিজের, আপনার, আর ভাব অর্থে সৃষ্টি, বিশ্ব, সংসার, অর্থাৎ নিজের সংসার, নিজের সৃষ্টি, নিজের বিশ্ব, এই ত, এখন এ নিজের বিশ্ব, সংসার কার? এ তোমার আমার সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা নয়, বিশ্ব নিয়ে আলোচনা। জগতের সৃষ্ট জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতাগুল্ম ইত্যাদির সঙ্গে তোমার আমার কোন সম্বন্ধ নেই। যাঁর সঙ্গে আছে তিনিই করছেন। তা হলেই প্রতিপন্ন হোল যে নেচার স্বভাব নামে একটা যা আছে, সেটা কি? সে সৃষ্টিকর্ত্তা, কেন না যে কর্ম্ম করে সেই ত কর্ত্তা, বা যে সকলের বড় তাকেই কর্ত্তা বলা যায়। সেই যে গোড়ায় একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই

নিয়ম যতদিন এ চরাচর থাকবে, যতদিন মহাপ্রলয় না হবে, ততদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

আমি। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকা যাক, খেতে পাওয়া যাবেই।

সন্ন্যাসী। নিশ্চয়ই, তার অন্যথা হবে না, সে কথা ত আগেই বলেছি, তার সঙ্গে যদি সাধনবল থাকে তা হলে ইচ্ছায় কার্য্য হবে। যেমন তোমার আজ বাগবাজারের রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে হয়েছে, অমনি কোথা থেকে রসগোল্লা এসে পড়ল। নচেৎ সাধারণ পেট ভরাবার খাবার যেখানেই যে ভাবে থাক না কেন, আপনি এসে পড়বে।

আমি। আমি দীক্ষিত নই, আমার সাধনা করবার ক্ষমতা কই?

সন্ন্যাসী। দীক্ষিত না হও, ঠিক সময় হলে হয়ে যাবে। তোমার পূর্ব্বজন্মের গুরু কোথা থেকে এসে জুটে যাবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে গায়ত্রী জান ত? গায়ত্রী জপ করে সিদ্ধ করে নিতে পারলে অনেক এগিয়ে থাকতে পারবে। গায়ত্রী জপ কর ত?

আমি। আজ্ঞে, বলতে লজ্জা করে, পৈতে হওয়ার পর এক বছর খুব ধুম পড়ে গিছ্‌লো। তার পর আর যে কখন হাতে পৈতে জড়িয়েছি মনে পড়ে না।

সন্ন্যাসী। ভাল কর নি। যা হবার হয়ে গেছে, প্রতিজ্ঞা কর, সন্ধ্যা-গায়ত্রী না করে জল গ্রহণ করবে না।

আমি। চলুন আঁচিয়ে আসি। আর কিছু খাবেন কি?

সন্ন্যাসী। না বাবা! খুব খেয়েছি।

আমরা হাত মুখ ধুয়ে এলাম। আমি বলিলাম "আপনার বিছানা করে দিতে বলি?"

সন্ন্যাসী। বিছানা করতে হবে না, আমি এখুনি যাব।

আমি। এত রাত্তিরে কোথায় যাবেন?

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসী খুব হেসে বল্লেন, "দিন রাত আমার সবই সমান। যাবার জায়গার কি অভাব আছে বাবা! এত বড় জগৎটা সমস্তই রয়েছে, যেখানে হয় এক জায়গায় গিয়ে পড়ব'খন। ভাববার কোন দরকার নেই।

আমি। রাতটা থাকলে ভাল হোত, আরও কিছু উপদেশ দিতেন।

সন্ন্যাসী। তোমায় উপদেশ দেবার বড় বেশী কিছু নেই, যখন দরকার হবে পাবে। আবার দেখা হবে। এখন আমি আসি বলে উঠিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গেলাম কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বেশী দূর যেতে দিলেন না। আমি বাসায় এসে শুয়ে কত কথাই ভাবতে

তৃতীয় অঙ্ক

বিছানায় শুলাম বটে কিন্তু ঘুম হোল না। ভাবছি চাকরি বাকরি না করলেও খেতে পাওয়া যায়। একবার বেরিয়ে এর সত্যাসত্য দেখতে হবে। ভাবনার কূল কিনারা নেই। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, স্বপ্নে দেখলাম মা যেন বলছেন "ভয় কি বাবা, সত্যিই ত কেউ না খেয়ে মরে না, যখন ইচ্ছে হয়েছে বেরিয়ে পড়।" তন্দ্রার ঘোর তখনি কেটে গেল, আমিও উঠে বসলাম। মন এতদূর চঞ্চল হয়েছিল যে আর তাকে বশে রাখা যায় না। বেশীক্ষণ আর ইতস্ততঃ করতে ইচ্ছে হোল না, ভাবলাম এখনও যদি বেরিয়ে যাই বোধ হয় তাঁকে ধরতে পারি। আবার

ভাবলাম দুর হোকগে ছাই, এ সুখ, এ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে কোথা যাব? নাঃ—যাব না বলে শুয়ে পড়লাম। জোর করে শুলাম বটে কিন্তু শয্যাকণ্টকী হোল। আবার উঠে ভাবলাম—আর থাকব না, দেখি কি হয়, এই ভেবে তখুনি এক কাপড়ে একটি কামিজ গায়ে ও চটি জুত পরে বেরিয়ে পড়লাম। বেরবার সময় আপনি মুখ দিয়ে "দুর্গা শ্রীহরি" বেরিয়ে পড়ল। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি আড়াইটে।

বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, গঙ্গার ধারে ধারে চলতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে চলেছি, সকালে চা টোষ্ট খাওয়া অভ্যাস, দেখি পাই কি না? ক্রমে পুর্ব্বদিক ফরসা হতে লাগল। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে চোখ ভারী হ'য়ে বুজে আসছিল। সমস্ত রাত ঘুমুই নি, ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ে খানিক ঘুমিয়ে নি। কিন্তু শোয়া হল না, ঝোঁকের মাথায় সোজা চলতে লাগলাম। বোধ হয় বেলা তখন সাতটা হবে, একটা বাংলার ফটকের সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে দেখি একজন সাহেব ও মেম দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সাহেবটা আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বল্লেন— "হ্যালো, ডক্টর (Hello Doctor) Where are you off to in such a wretched condition, are you mad? তুমি এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ, পাগল হয়েছ নাকি? সাহেবের বাড়ী আমি দু একবার চিকিৎসা করেছিলাম, তাই আমার সঙ্গে জানা শোনা ছিল। আমি বললাম Good morning, yes Mr. Foster, I am mad, I am in hunt of wild goose সুপ্রভাত মিষ্টার ফষ্টার, সত্যিই আমি পাগল হয়ে ভুতের বেগারে ঘুরে বেড়াচ্ছি! I am awfully thirsty, would you oblige me with a cup of tea. আমি

অত্যন্ত পিপাসিত, এক পেয়ালা চা দিয়ে আমায় বাধিত করবে কি ?

সাহেব। Oh—most gladly, come in and have chotta hazree, Wini! would you mind arranging for doctor? ওঃ, আনন্দের সহিত, ছোট হাজারী খাবে এস। মেম সাহেবকে সম্বোধন করে বল্লেন "উইনি! তুমি ডাক্তারের জন্য বন্দোবস্ত করবে কি?" মেমসাহেব Certainly dear নিশ্চয় প্রিয়তম! লঘু পদবিক্ষেপে বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। আমিও সাহেবের সঙ্গে গল্প কত্তে কত্তে বাঙ্গলায় গিয়ে ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ পরে খানসামা চা টোষ্ট আর ডিমসিদ্ধ একটি ট্রে করে এনে আমি যেখানে বোসেছিলাম একটি টিপায়ের ওপর রাখলে। আমিও তৎক্ষণাৎ বিনাবাক্যব্যয়ে সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলাম। খানিকক্ষণ তাঁদের সঙ্গে গল্প করে, ধন্যবাদ দিয়ে উঠলাম। সাহেব বলিলেন "will you have mytrap and go back আমার টম্‌টমে ফিরে যাবে কি?

আমি। No thanks, I must see to its end ধন্যবাদ, এর শেষ আমায় দেখতেই হবে বলে বেরিয়ে পড়ে, বরাবর গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরলাম।

ক্রোশখানেক গিয়ে খেয়াঘাটে গঙ্গা পার হয়ে একটা আমবাগানের ভিতর গিয়ে বসলাম। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রোদও খুব প্রখর হয়েছিল। যেদিন বেরিয়েছিলাম, সে দিন হয় ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্রের দু' একদিন। গাছতলায় বসে মনে মনে ভাবলাম সকালে ত ঠিক খাবার জুটেছিল, এইবার দেখি এই তেপান্তর মাঠে কি খাবার মা দেন। সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে, এতটা পথ চলে, ক্লান্তিবশতঃ কেমন

আলস্য বোধ হতে লাগল ও চক্ষুও চেয়ে থাকতে নারাজ হয়ে বুজে আসতে লাগল, কিছুতেই খুলে রাখতে পারলাম না, সেই গাছতলায় মাটীতে শুয়ে পড়বামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি না কিন্তু সূর্য্যদেব তখন হেলে পড়েছেন। "বেটা উঠ" এই কথা কাণে যাবামাত্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখলাম, দুজন সন্ন্যাসী আমার পাশে বসে আছেন। আমাকে একজন বললেন "বেটা তুম্ বহুৎ শোগয়া ?"

আমি। হাঁ বাবা বহুৎ ক্লান্ত হুয়া কিনা, তাই ঘুমায়কে পড়া।

সন্ন্যাসী। বহুৎ আচ্ছা, জল লেকে হাত মুখ ধো ডালো।

আমি তাঁহার প্রদত্ত কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মুখে হাতে দিলাম। অপর সন্ন্যাসীটি নির্ব্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসেছিলেন। তিনি ঝুলি থেকে একটি খরমুজার মত ফল বার করে আমায় খেতে দিলেন, আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে বদনে দিলাম, খিদেও খুব পেয়েছিল। ফলটি খুব সুস্বাদু, কিন্তু আমাদের দেশের খরমুজা নয়। খাওয়া শেষ হলে দুটি পেঁড়া দিলেন, অম্লানবদনে খেয়ে ফেললাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "আওর কিছু পাওগে ?" আমি না বলে কমণ্ডলুর জল আকণ্ঠপান করে "আঃ" বলে ফেললাম। বাস্তবিক খুব তৃপ্তি হয়েছিল। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম "আপনারা কাঁহা যাগা ?" তাঁরা বলিলেন "সামনেকা পাহাড় পর যায়েঙ্গে।"

আমি। হামও আপনাকে সাথমে যাগা।

সন্ন্যাসীদ্বয় "আচ্ছা—চল" বলিয়া দ্রুতপদে চলতে লাগলেন। আমি যতদুর সম্ভব তাঁদের সঙ্গে জোরে চলতে লাগলাম কিন্তু খানিকদুর গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লাম। তাঁদের সঙ্গে চলা আমার কর্ম্ম নয়। তাঁরা

সমানভাবে চলে যেতে যেতে এক একবার পেছন ফিরে দেখছিলেন। আমি একটু দম নিয়ে আবার চলতে লাগলাম, কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছিলাম। তাঁরা তখন পাহাড়ের ওপর অনেকটা উঠে পড়েছেন। আমি খানিকটা পাহাড়ে উঠে একটা বড় পাথরের ধারে বসে জিরিয়ে নিলাম। এদিকে বেলা তখন পড়ে আসছে, আবার উঠতে লাগলাম। যখন প্রায় আধাআধি উঠেছি, ওপরে চেয়ে দেখি তাঁরা পরপারে নামছেন। পাঁচ সাত পা ওপরে উঠে আর তাঁদের দেখতে পেলাম না। আমি মরিবাঁচি করে যখন ওপরে উঠলাম তখন সূর্য্য অস্ত যাব যাব হয়েছেন। নীচের দিকে কাউকে আর দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পূর্ব্বে কখন দেখিনি, তাই আজ দেখবার বড় সাধ হওয়ায় বসে দেখতে লাগলাম। সে যে কি মনোহর দৃশ্য চোখে না দেখলে, বলবার যো নেই।

সূর্য্য অস্ত দেখে নীচে নামতে [illegible] করলাম। প্রায় অর্দ্ধেক নেমেছি এমন সময় গা ঢাকা হয়ে এল, তাড়াতাড়ি আমি নামতে লাগলাম। যখন একবারে নীচে নামলাম, তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। সেদিন কি তিথি জানা না থাকায় কখন চাঁদ উঠবে ঠিক করতে পারলাম না। এতক্ষণ বেশ নির্ভয়ে আসছিলাম কিন্তু অন্ধকার হওয়ায় একটু ভয় হোল। এই পাহাড়ের নীচে বন জঙ্গল, কোথায় সাপের ঘাড়ে পা দোব কি কখন বাঘের সুমুখে পড়ব তার ত স্থিরতা নেই। তখনি আবার সাহস হল, ভয় কি মা রক্ষে করবেন। উপত্যকায় পড়ে খানিক গিয়ে, একটি ছোট ঝরণার নদী, ঝির ঝির করে সামান্য হাঁটু ডোবা জল বয়ে যাচ্ছে। সেখানে একখানা পাথরের ওপর বসে, হাত পা ধুয়ে, সন্ধ্যা করতে বসে গেলাম। গায়ত্রী জপ করতে লাগলাম

এ জপটা প্রাণের দায়ে। কতক্ষণ জপ করেছিলাম বলতে পারি না তবে চেয়ে দেখলাম চাঁদ উঠেছে। দূরে বুনো জন্তুর চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বসে ভাবছি রাত্তিরটা কোথায় কাটাই, আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় আমার ডান দিক থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ কাণে লাগল আর সেইদিকে একটা আলোও দেখতে পেলাম। আমি আলো লক্ষ্য করে সেইদিকে খানিকটা গিয়ে দেখলাম, সুমুখে একটি ছোট মন্দির, আর মন্দিরের সুমুখে একজন সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে, একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে আগুণ ধরিয়ে বাঘছালের ওপর বসে সমস্বরে মহিম্নস্তব পড়ছেন। আমি তাঁদের কাছে দাঁড়াবামাত্র, আমার দিকে চেয়ে, মুচকী হেসে, ইস রায় বসতে বললেন, আমি বসলাম। স্তব পাঠ শেষ হলে, যিনি বাঘছালে বসেছিলেন আমায় কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন "বেটা তু বড়া নসিব্বর হ্যায়, আশীষ করতে হুঁ, তেরা মনসা পুরা হো।" একজনকে ডেকে বললেন "ইনকো কুছ প্রসাদী দেও।" সে উঠে মন্দিরের মধ্যে থেকে, দুধ, ফল আর মিষ্টি এনে দিলে। আমি খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে আবার তাঁর কাছে এসে বসলাম। তিনি শিষ্যদের জ্ঞানকাণ্ড ব্যাখ্যা করছিলেন, আমি কিন্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না। একপ্রহর পরে সকলে উঠে তাঁকে প্রণাম করে কোথায় চলে গেল। যে লোকটি আমায় দুধ এনে দিয়েছিলেন, তিনি আমায় সঙ্গে করে কাছেই একটি গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন "ভিতর যাকে শোইয়ে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছা হ্যায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপ শোগা নেহি।" তিনি বললেন "দুসরামে হাম শোয়েঙ্গে।" আমি দুর্গা শ্রীহরি বলে বাঘছালের ওপর শুয়ে তখনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে দেখি গুহার ভেতর রদ্দুর এসেছে, তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম। প্রাতঃকৃত্য করে নদীতে মুখ হাত ধুয়ে মন্দিরের দিকে গেলাম। গতরাত্রে যে রকম সুনিদ্রা হয়েছিল, সে রকম ঘুম বহুদিন ঘুমাই নি। মন্দিরের কাছে গিয়ে কেবল বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম আর কেউ নেই। মন্দিরের সুমুখে খানিক জায়গা গবোর দিয়ে নিকোন মধ্যে সেই ধূনী জ্বলছে। যেন রাবণের চিতে দিন রাত হু হু করে জ্বলছে। মন্দিরের ডানদিকে খুব লম্বা একটা চালা, খড় পাতা দিয়ে ছাওয়া; তার মধ্যে আট দশটি বাছুর বাঁধা; কিন্তু একটিও গরু দেখতে পেলাম না। তার পাশে খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে পাঁচ সাতটা মহিষের বাছুর বাঁধা রয়েছে। কিন্তু একটিও মহিষ ছিল না। চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখে মন্দিরের কাছে এলাম। সন্ন্যাসী আমায় বল্লেন, "থোড়া দুধ পিও।"

আমি। স্নান, সন্ধ্যা করকে কিছু খাগা।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা বাবা, যাও নদীমে স্নান করকে আও।

আমি বহুত আচ্ছা বলে স্নান করতে গেলাম। নদীতে জল জোর এক হাঁটু, খুব পরিষ্কার আর এত মাছ যে আমার পায়ে খাবলাতে লাগল। আমি স্নান করে ফিরে এসে মন্দিরের ভেতর গিয়ে একখানি কুশাসনে বসে জপ করলাম। বাইরে এলে সন্ন্যাসী একটা পাতার ঠোঙ্গায় খানিক গরম দুধ, একটা নাসপাতির মত ফল আর একটা ডালিম দিলেন। আমি অম্লান বদনে ছোট হাজরী করলাম। খেয়েদেয়ে জিজ্ঞেস কল্লাম "বাবা! আপকা শিষ্য সব—কাঁহা গিয়া হায়?

সন্ন্যাসী। তপস্যা করনে গেয়া।

আমি। কাঁহা তপস্যা করতে গেয়া?

সন্ন্যাসী। গহন বন মে।

আমি। বাবা হাম্‌কো শিষ্য করে গা?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন "নেহি, হাম তোমরা গুরু নেহি।

আমি। তবে হামরা গুরু কাঁহা?

সন্ন্যাসী। সময় হোনেসে মিলে গা।

আমি আর কোন কথা না বলে সুমুখের পাহাড়ে উঠবার জন্যে অগ্রসর হলাম।

চতুর্থ অঙ্ক

সম্মুখেই ঘন বন, বড় বড় গাছগুল যেন আকাশ ছোঁবার জন্যে মাথা ও শাখা বাড়াচ্ছে। ঘন পাতার ভেতর দিয়ে রোদ ঢোকবার চেষ্টা করচে। বনের ভেতর খুব অন্ধকার, ক্বচিৎ কোন জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকে সামান্য একটু আলো করেছে। গাছের উপর দুপুর বেলা নানা রকমের পাখী এমন সুন্দর শিশ দিচ্ছে ও গান গাচ্ছে, যে শুনলে মন মোহিত হয়ে যায়। বনে যে সব পাখী দেখলাম, সচরাচর সে সব পাখী সহরে বা পাড়াগাঁয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। খরগোস, সজারু আর হরিণ চারি দিকে বেড়াচ্ছে, মানুষ দেখে ভয় পায় না। তারা হয়ত মনে করে যে এরাও আমাদের মতন বুনো। সমস্ত দিন ঘুরে পাহাড়ের নীচে একটি কুটীর দেখতে পেলাম। মনে করলাম যে কোন সাধু সন্ন্যাসী বনের ভেতর তপস্যা করতে গেছেন, সন্ধ্যা হলে আসবেন। আমিও ক্লান্ত হওয়ায় কুটীরের বাইরে একখানা পাথরের ওপর বসলাম। খানিক

পরে একটি বৃদ্ধা লাউয়ের খোলা হাতে করে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে বল্লেন "বড় খিদে পেয়েছে না ?"

আমি। খিদে তত বেশী পায়নি, তবে তেষ্টা পেয়েছে। তুমি মা কে ?

বৃদ্ধা তাঁর হাতের সেই লাউয়ের কমণ্ডলু দিয়ে বল্লেন "রাত্তিরে আর কোথাও যেওনা বাবা, কুঁড়ের ভেতর শুয়ে থেক, আর খিদেপেলে কোনে একটা হাঁড়িতে খাবার আছে খেও। আমার আসতে যদি রাত হয় ভয় পেও না।

আমি। আপনি কোথায় যাবেন ? সন্ধ্যা হতে ত বড় বেশী দেরী নেই।

বৃদ্ধা। কোথায় আর যাব বাবা ! এইখান থেকে আসছি। একটা দুরন্ত ছেলে বাঘ নিয়ে খেলা করছে, বাঘটাকে সামলাতে পারছে না। দেখি যদি তাকে বাঁচাতে পারি।

আমি। আমি আপনার সঙ্গে যাব ?

বৃদ্ধা। বাপরে—তোমায় সেখানে কি নিয়ে যেতে পারি ? যাও কমণ্ডলুটা ভেতরে রেখে এস।

বৃদ্ধা আমার সঙ্গে যেন ঠিক কচী ছেলের মত ব্যবহার করলেন। বৃদ্ধার যে কত বয়েস হয়েছে তা বোঝবার যো নেই। এত বয়স হয়েছে তবু রূপ যেন ফেটে পড়ছে।

আমি কুঁড়ের ভেতর কমণ্ডলু রাখতে গেলাম, কুঁড়ের ভেতরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কোনে একদিকে সত্যই একটা হাঁড়ি রয়েছে, আর একধারে শোবার জন্যে একখান মস্ত হরিণের ছাল পাতা আছে। কমণ্ডলুটা রেখে বাইরে

বেরিয়ে এসে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। মনে করলাম এখুনি ফিরে আসবে, কিন্তু সেটা আমার ভুল। ফিরে আসা দূরের কথা, আর কখনও তাঁকে দেখতে পাইনি। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল, চারিদিকে বন্যজন্তুর ছুটোপাটী আরম্ভ হোল। একদল হরিণ আমার সমুখ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, তাদের পেছনে পেছনে দুটো প্রকাণ্ড বাঘ হেলতে দুলতে হরিণগুলো যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকে গেল আর গায়ের বোটকা গন্ধ ছড়িয়ে গেল। আমার ভাগ্যি ভাল যে আমার দিকে তাকায় নি। আমার আর বাইরে বসে থাকতে সাহস হল না, কুঁড়ের ভেতর গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। কুঁড়ের ভেতর এত আলো হল কোথা থেকে? এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, পাহাড়ের গায়ে গর্ত্তের ভেতর থেকে আলো আসছে দেখে কাছে গিয়ে দেখলাম যে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একখানা পাথর থেকে আলো বেরুচ্ছে। শোনা ছিল মাণিকে আলো হয়, আজ সত্যই সেই মাণিক দেখলাম। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। মনে পড়ল সাতরাজার ধন এক মাণিক, এটা নিয়ে যদি ফিরে যাই, তা হলে খুব বড় লোক হতে পারি। যদি বড়লোক হবার ইচ্ছে থাকত তা হলে নিজে উপার্জ্জন করে বড়লোক হতে পারতাম। যে কাজে ঢুকেছিলাম তাতে ত কম উপার্জ্জন ছিল না। দূর হোক্ গে—আবার লোভ কেন—যা দেখতে সব ছেড়েছুড়ে এসেছি তার শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে। পাথরখানা যেখানে ছিল সেইখানে রেখে দিলাম।

কোণ থেকে হাঁড়ীটাকে, কি খাবার আছে দেখব বলে, টেনে আনলাম। তার ভেতর কিছুই নেই খালি হাঁড়ী, ভারী রাগ হল, বুড়ীবেটি মিছে কথা বলে গেল? হাঁড়ীটা যেখানে ছিল সেইখানে

রেখে ছালের ওপর শুয়ে ভাবতে লাগলাম আজ রাত্তিরে উপোস— সন্ন্যাসীর কথাও মিথ্যে হল। একদিন যা হয় জুটে ছিল, আজ দেখছি হরিমটর কিছুই জুটল না। যাক—সায়ংসন্ধ্যা করা হয়নি ত, যেমন মনে পড়া অমনি উঠে বসে হাতে পৈতে জড়িয়ে বসে গেলাম। প্রায় ঘণ্টা-খানেক জপ করার পর, যেন মনে হল, বাইরে খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছে, মুখ বাড়িয়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আবার জপে বসলাম। জপ ভাল লাগবে কেন। খাঁদেয় নাড়ী জ্বলছে। বুড়ী বলেছিল যা খাবার ইচ্ছে হবে হাঁড়ী থেকে নিয়ে খাস্‌ কিন্তু হাঁড়ীতে যে কিছুই নেই। আবার দেখি বেদের হাঁড়ীতে কি আছে। ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, একটা বেদে আর বেদিনী আমাদের পাড়ায় এসেছিল। তাদের কাছেও একটা কেলে হাঁড়ী ছিল। যে যা চেয়েছিল সে সেই হাঁড়ীর ভেতর থেকে তাকে দিয়েছিল। আমি আঙ্গুর চেয়েছিলাম, আমায় আঙ্গুর দিয়েছিল। এ হাঁড়ীটা যদি সেই রকম হয়, অনেক দিন রসগোল্লা খাওয়া হয় নি, যদি পাই বড় মজা হয়। আবার ভাবলায় দুর্‌— আমি পাগল হলাম না কি ? এই অজগর বনের ভেতর রসগোল্লা পাব ? মন কিন্তু মানে না, খাঁদেয় নাড়ী জ্বলছে, আবার হাঁড়ীটা টেনে আনলাম। ভেতরে হাত দিয়ে, বল্লে বিশ্বাস করবে না, সত্যিই রসগোল্লা পেলাম। কালবিলম্ব না করে বদনে দিতে লাগলাম। প্রাণভরে একপেট খেয়ে জল খেলাম, আর যেখানকার হাঁড়ি সেইখানে রেখে এসে শয়নে পদ্মলাভ, আর পাঁচ মিনিট মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই সন্ন্যাসী যিনি দানাপুরে দর্শন দিয়ে বাড়ী থেকে টেনে হেঁচড়ে বার করে এনেছেন। শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন "কেমন হে ? এবার বিশ্বাস হল মা দিচ্ছেন তাই খাচ্ছি। বনের মধ্যে

রসগোল্লা পাওয়া সম্ভব কি ? যাহোক্ আরও দিনকতক ঘুরে বিশ্বাস টাকে পাকা করে ফেল, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে।”

কমণ্ডলুর জলে মুখ হাত ধুয়ে জপ করলাম। কিছু খাবার জন্যে হাঁড়িটা আন্‌তে গিয়ে দেখি হাঁড়ী অদৃশ্য, সেখানে হাঁড়ী নেই। বড় আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক খুঁজলাম কিন্তু বৃথা। মনক্ষুণ্ণ হয়ে কুঁড়ের বাইরে এসে আবার পাহাড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করলাম।

এ কদিনে কতদূর আর কোথায় এসেছি কিছুই স্থির করতে পারি নি, বরাবর পূর্ব্বদিক ধরে চলেছি।

পঞ্চম অঙ্ক।

ক্রমাগত পাহাড়ে উঠ্‌ছি, তার যেন শেষ নেই। সূর্য্যদেব ঠিক মাথার উপর এসেছেন, গাছ পালা একটাও নেই। মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের আড়ালে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিচ্ছি, আর পাহাড়ে উঠছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এত রোদ্দুর তবু ক্ষুৎ-পিপাসা নেই। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় একটি বাগানের ভেতর এলাম, ফুল বা আমবাগান নয়, ডালিমের বাগান। গাছগুলি এমন ভাবে সাজান, মনে হয় কে যেন গাছগুলি সার দিয়ে বসিয়েছে। পাকা ডালিম, গাছতলায় অনেক পড়ে আছে, পাখীরা আনন্দ করে খাচ্ছে। আমি গাছ ছেকে পাকা পাকা গোটাকতক পেড়ে খেতে লেগে গেলাম। নিকটে ঝরনা থেকে জল খেয়ে আবার পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করলাম। সন্ধ্যার প্রক্কালে দূর থেকে ধোঁয়া দেখ্‌তে পেয়ে সেখানে গেলাম। চার পাঁচজন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন, আমায় দেখে একজন বল্লেন “আও

বাবা বৈঠ কুছ পাও"। গোটা দুই পেঁপের মত ফল আর হাত খানেক লম্বা একটা মূলো, অনেকটা খামআলুর মত দেখতে, আমায় দিলেন।

তাঁরাও সেই ফল আর মূলো খেতে লাগলেন, আমিও খেলাম। এমন সুস্বাদু ও সুগন্ধী ফল মূল কখনও খাইনি, চোখেও দেখিনি, জগদম্বার রাজ্যে কোথায় যে কি অমূল্য নিধি আছে, তা কে বলতে পারে। এসব দেখে শুনে আমার মন ক্রমে তাঁর উপর বিশ্বাসী হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা আমায় একটা গুহা দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন "রাত মে বাহার নেহি হইও, ইধার বহুৎ বাঘ ভালুক হ্যায়" আমি গুহায় ঢুকে সন্ধ্যে করে মাটীতে শুলাম। এখন ভূয়ে শুয়ে কোন রকম ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। যখন ঘরে ছিলাম পুরু গদির ওপর শুয়েও ভাল ঘুম হত না।

বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে দুই তিন মাস কাটল। জামা জুতো কাপড় সব ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁক হয়ে গেছে। জুতো ফেলে দিয়েছি; জামাটাও ফেলে দিলেই হয়, কাপড়খানা শতধা ছিন্ন হয়েছে; কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করা হচ্চে। যদিও এখানে লজ্জা করবার কেহই ছিল না; কেন না আজকাল প্রায়ই মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না। গাছের ফল আর ঝরণার জলে দিন কাটছে, তবুও অভ্যাসের দোষে কোমরে কাপড় না থাকলে কেমন বাধ বাধ ঠেকে;

এক দিন পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার মধ্যে পড়লাম, সেখানে চষা জমি দেখে বড় আনন্দ হ'ল। ভাবলাম নিকটেই লোকালয় আছে, অনেক দিন পরে মানুষের মুখ দেখতে পাব? ফল মূলের বদলে ভাত বা রুটি খেয়ে মুখ বদলান হবে। খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে জন কতক উলঙ্গ সবচুলো মানুষের সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা আমায় দেখতে পেয়েই আমার কাছে এসে কি বল্লে বুঝতে পারলাম

না। তারা পরস্পরে বলাবলি করে আমায় ইসারা করে ডেকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌ল। গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখলাম পুরুষ মাত্রেই উলঙ্গ। স্ত্রীলোকদের কেবল কোমরে একটুখানি পশুছাল জড়ান, বুক খোলা, মাথার চুল জড় করে মাথার উপর ঝুঁটি বাঁধা। হাতে বোধ হয় হাতির দাঁতের কি হাড়ের, চুড়ির মত অনেকটা দেখতে পরা, মণিবন্ধেও ঠিক সেই রকমের গহনা, গলায় মালা, কিন্তু কিসের মালা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্ত্রীলোকগুলি কাল কাল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোও উলঙ্গ। তারা আমায় দেখে বোধ হ'ল খুব খুসী হয়েছে। মাগি-গুলো দাঁত বার করে আমার সঙ্গে লোকদের কি জিজ্ঞাসা করলে, তারাও সেই রকম হাসতে হাসতে উত্তর দিলে। ঘরগুলো পাতা লতা দিয়ে ছাওয়া, উঁচুতে চার হাতের ওপর নয়। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, মুরগী পোষা আছে, আবার মাঝে মাঝে দোরে দুচারটে হরিণও বাঁধা দেখলাম।

তাদের সঙ্গে গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটা কুঁড়ের কাছে এলাম। এটা অন্যগুলোর চেয়ে উঁচু আর চার দিক খোলা, ঠিক আমাদের দেশের আটচালার মত। তার মধ্যে সাত আট জন বসে আছে, একজন কেবল একটু উঁচু বেদীর 'ওপর একখান মৃগচর্ম্মে বসে আছে। তার পরণে একখান মৃগচর্ম্ম। সকলে এসে তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, আমাকেও ইসারায় করতে বল্লে। আমি কিন্তু প্রণাম করলাম না। তারা জোর করে আমার ঘাড় ধরে মাথা মাটীতে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে কি বলাবলি করে আমায় রেখে চলে গেল। খানিক পরে একজন একটা মশাল জ্বেলে এনে পুঁতে রাখল, আর এমন দুর্গন্ধ যে মাতৃদুধ পর্য্যন্ত উঠে যায়। যে লোকটা বেদীর ওপর বসে

ছিল, সে কি বলতে, একজন আমায় সেখান থেকে নিয়ে কাছেই একটা কুঁড়ের ভেতর রেখে দুটো বড় বড় কুকুরকে ডেকে আমার পাহারায় রেখে গেল। খানিক পরে একটা পাতায় খানিকটা মাংস পোড়া রেখে গেল। আবার দুটো মাটির ভাঁড়ে, একটায় দুধ আর একটায় আঙ্গুরের রস রেখে, হাত নেড়ে খেতে বলে, ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেল। আমি সন্ধ্যা করে একটা ভাঁড়ে চুমুক দিলাম, সেটা আঙ্গুরের রস, অবিশ্যি টাটকা নয়, রোদে পাকান, আস্বাদ টক্। তার পর মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, নেশায় অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে বসে আছি, একটা লোক আমায় ডেকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে শৌচ প্রস্রাবের একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে, একটু দূরে গিয়ে বসল। আমিও কাজ সেরে ডোবায় হাতমুখ ধুয়ে কুঁড়েয় ফিরে এলাম।

সন্ধ্যে করে বাইরে বেরুতে গিয়ে পারলাম না, কেন না দুটো বড় বড় কাল কুকুর দরজায় বসে ছিল। কুকুর দুটোকে দেখলে বোধ হয় বড়ই দুর্দান্ত, আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল, ভয়ে বেরুলাম না, কুঁড়ের ভেতর ঢুকে বসলাম। খানিক পরে দুটি যুবতী স্ত্রীলোক দুটো ভাঁড় হাতে করে এসে ভাঁড় দুটো রেখে বসল। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তত কালও নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ চোখের গড়নও ভাল। আমার সুমুখে বসে নানারকম হাব ভাব দেখাতে লাগল, আর হেসে হেসে ঢলে পড়বার মত করতে লাগল, কিন্তু আমি তত কাছে ছিলাম না, তাই গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হয়নি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়। সে তার সঙ্গিনীকে কি বল্লে, সে তখনি বেরিয়ে গেল। যুবতীটি উঠে ঝাঁপটা একটু টেনে আড়াল করে দিয়ে একেবারে

আমার গা ঘেঁসে বসে ঘন ঘন চুম খেতে লাগল। আমি তার এই ব্যবহারে আরাম হয়ে গেলাম। কেমন করে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাব ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। ভাবছি ভগবান এ আবার কি বিপদে ফেললে, দয়াময় উদ্ধার কর। যুবতী হঠাৎ আমার গলা ছেড়ে দিয়ে চট্ করে গিয়ে ঝাঁপটা খুলে, হাসতে হাসতে ভাঁড় দেখিয়ে খেতে বল্লে। আমি ইসারায় জানলাম পরে খাব। খাব কি ভয়ে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে।

তার ধড়ফড়িয়ে আমায় ছেড়ে দেওয়ার কারণ, চারজন লোক কুঁড়ের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তিন জন সশস্ত্র আর একজন নিরস্ত্র। যে লোকটি নিরস্ত্র সে পূর্ব্বদিন বেদীর ওপর বসে ছিল। তাদের অস্ত্র অনেকটা টাঙ্গির মত, একখানা ভোজালের মত। নিরস্ত্র লোকটি মেয়েটিকে কি বলায় সে হাসতে হাসতে তার কাছে গিয়ে আমায় দেখিয়ে কি বলাবলি করতে লাগল। দলপতি বা রাজা কুঁড়ের ভেতর ঢুকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে মাংস খাইনি কেন? আমিও সেই রকম ইসারায় জানালাম, আমি পোড়া মাংস খাই না। তার পর ভাঁড় দেখালে, আমিও সেই রকম করে জানালাম খাবখ'ন। রাজা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াতে সে কি বললে, রাজা তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে তার সঙ্গীকে কি বললে। সে হাঁটু গেড়ে তার পায়ে হাত দিয়ে কুঁড়ের ভেতর আমার কাছে এসে একটা ভাঁড় তুলে ধরলে, আমি চুমুক দিলাম, কাঁচা দুধ। আর একটা ধরতে আমি খেতে ইতস্ততঃ করায়, রাজা খেতে ইসারা করলে কাজেই আর ইতস্ততঃ না করে খেলাম, এটা আঙ্গুরের রস রোদে সিদ্ধ করা। খেয়ে বাইরে এলাম, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেল। আমি ভাব্‌লাম হয় ত মেয়েটা

আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে তাই শাস্তি দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে।

আটচালার পেছনে কতকগুলো কুঁড়ে, এ কুঁড়েগুলো গ্রামের অন্য-গুলোর চেয়ে খুব ভাল। এখানে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। এই স্থানে একটি কুঁড়ের মধ্যে আমার স্থান হ'ল; এধারে পুরুষের সংখ্যা কম, নেই বল্লেই হয়, স্ত্রীলোকই বেশী। আমার আহারের জন্য কতক ফল, দুধ আর আঙ্গুরের রস একটি যুবতী দিয়ে গেল। পাহারা দেবার জন্যে এখানে রাখেনি। আমার কুঁড়ের সুমুখে, সামান্য একটু দূরে ধুনী জ্বলছিল, আমি দুধের ভাঁড়টা বসিয়ে গরম করে নিয়ে এলাম, রাত্তিরেরও ঐ ব্যবস্থা।

রাত্তির প্রায় দুপুরের সময় কে যেন ঝাঁপ ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আমি তখন আঙ্গুরের নেশায় ভোঁ হয়ে পড়ে আছি, তাই ঠিক বুঝতে পারলাম না, চোখ খুলে দেখবার মতন অবস্থাও আমার ছিল না কিন্তু যখন মানুষের হাত আমার গায়ে ঠেকল তখন আর সন্দেহ রইল না। অনুভবে বুঝলাম কে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে, টেনে তুলে বসিয়ে দিল। আমি বসবার পর গলা জড়িয়ে চুম খেতে লাগল, তখন বুঝলাম রাজকন্যা আবার প্রেম কত্তে এসেছেন। কি করে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাই? মেয়েটা একটা ভাঁড় আমার মুখে ধরলে, আমি গন্ধে বুঝলাম আঙ্গুরের রস। চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেললাম, এটা আগেকার চেয়ে বেশী টক্ আর ঝাঁঝাল। আমি খেয়েই শুয়ে অচেতনের ভাণ করে পড়ে রইলাম। সে আমার বুকের ওপর শুয়ে অনেকক্ষণ আঁটা-আঁটি করে, যখন দেখলে আমার নড়ন চড়ন নেই, অসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছি, তখন বুক থেকে নেমে, বাঁ পায়ের একটা লাথি মেরে

বেরিয়ে গেল। আমিও হাঁপ ছেড়ে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মেয়েটার ভয়ে দিনরাত নেশা করে পড়ে থাকতাম। তাকে আসতে দেখলে মড়ার মত পড়ে থাকতাম। সে এসে নেড়ে চেড়ে দেখে, সাড়া শব্দ না পেয়ে, বিরক্ত হয়ে ফিরে যেত। দু-এক দিন লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে তত কড়া পাহারা নেই, চেষ্টা করলে পালাতে পারা যায়। একদিন খুব অন্ধকার রাত্তিরে, আকাশে মেঘও ছিল, অবসর বুঝে এদিক ওদিক উঁকি মেরে দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ঝাঁপটা বন্ধ করে লম্বা দিলাম। বেশ নির্ব্বিঘ্নে খানিক দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম দশ বারজন মশাল জ্বেলে আসছে। দুটো কুকুর ঘেও ঘেও কত্তে কত্তে দৌড়ে আমার দিকে আসছে। আমি বুঝলাম ধরা পড়তেই হবে, তার চেয়ে আর না এগিয়ে ধরা দেওয়া ভাল। একটু চালাকী করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে যে আমি পালাইনি, মলত্যাগ করতে এসেছিলাম। যেমন ভাবা অমনি একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়া। যখন তারা আমার কাছ বরাবর এল, আমি উঠে সেই ডোবাটায় গিয়ে নামলাম। তারা আমায় দেখে একরকম বিদিকিচ্ছা চিৎকার করে উঠল। সে বিশ্রী চেঁচানী শুনলে পেটের পীলে চমকে ওঠে। আমি কাছা দিতে দিতে তাদের কাছে এসে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাচ্ছ। একজন দৌড়ে এসে আমার হাত ধরলে, আর একজন হাত ছাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি বললাম কোথাও যায় নি, বাহ্যে পেয়েছিল তাই এসেছিলাম। বোধ হল তারা আমার কথায় বিশ্বাস করলে। আমি বিনা আপত্তিতে তাদের সঙ্গে

ফিরে কুঁড়েয় এলাম, এসে শুয়ে পড়লাম। তারাও চলে গেল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় একজন আমায় ডেকে নিয়ে গেল। কুঁড়ের বাইরে দশ বারজন লোক কতকগুলো ছাগল আর ভেড়া বেঁধে বড় বড় মশাল জ্বেলে আমার জন্তে অপেক্ষা করছিল। তাদের সঙ্গে রাজা আর তাঁর মেয়েটিও ছিল। রাজার হাতে খুব বড় একটা টাঙ্গি। মেয়েটা আমায় দেখে মুখ ভার করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি তাদের কাছে এলে সকলে গ্রামের দক্ষিণদিকে চলতে লাগল। গ্রামের বাইরে একটা বেলগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বেলতলায় হাত দুই উঁচু মাটির গোল ঢিপি, ঢিপির গায়ে দুধের ধারা আর শুকনো ফুল ছিল, তার পাশে আগুন করা ছিল। আমি অনুমান করলাম এটা এদের দেবতা, আজ অমাবস্যা বলে পূজ দিতে এসেছে। তিথি নক্ষত্র দেখবার জন্তে যদিও পাঁজি ছিল না, তবুও অন্ধকার দেখে, আর তার আগের দিন শেষ রাত্রে চাঁদ দেখতে পাইনি বলেই আজ অমাবস্যা বলে সিদ্ধান্ত করে নিলাম। একটু পরে একজন খুব লম্বা শুকনো লোক অন্য দিক থেকে টলতে টলতে এসে দাঁড়াবামাত্র, সকলে মায় রাজা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। লোকটার চেহারা বড় ভয়ঙ্কর, লম্বা চার হাতের ওপর, হাতা পা সরু সরু কেবল চামড়া ঢাকা, চোখ দুটো গোল গোল আর তেমনি লাল। এত নেশা করেছে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একখানা মৃগচর্ম্ম পাতা ছিল, ধপাস্ করে তার উপর বসে, মন্ত্র আওড়াতে লাগল। মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত, তাই বুঝলাম কালীপূজা করছে। মুহুর্মুহু আগুনে গঁদের মত লাল আটা ফেলে দিতে লাগল। সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করে দিলে।

খানিক পরে ছাগল আর ভেড়াগুলকে উচ্ছুগ্গু করে আমার হাত ধরে বসিয়ে, মন্ত্র পড়তে লাগল।

আমায় যখন নিয়ে আসে তখন আমি ভেবেছিলাম আমায় পূজ দেখাবার জন্যে নিয়ে এসেছে কিন্তু এই মন্ত্রগুলো শুনতে শুনতে আত্মাপুরুষ শুখিয়ে যেতে লাগল। এ যে নরবলির মন্ত্র, তবে কি আমায় বলী দেবে? দেবে কি, উচ্ছুগ্যু করে দিলে যে? হা ভগবান! হে মা কালী এই জন্যে কি আমার এই মতিগতি দিয়েছিলে? মা গো! আসবার সময় তোমায় খবরও দিয়ে আসি নি কোথায় যাচ্ছি, সেই পাপে বুঝি এই শাস্তি। না জানি, মা গো, আমার নিরুদ্দেশ সংবাদ পেয়ে কতই কেঁদেছ, এখনও হয়ত তোমার শোক পথে নিবিড় দুঃখ্যু রইল মরবার সময় তোমায় দেখতে পেলাম না। কি কুক্ষণে সেই হতভাগা সন্ন্যাসিটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। মরবার জন্যে তার মোহিনী মন্ত্রে বশ হয়ে ঘর দোর ছেড়ে এত দূর এসেছিলাম। কত কথাই তখন মনে হয়েছিল। মার স্নেহ বাবার ভালবাসা মনে পড়ে আরো ব্যাকুল হলাম, বিশেষতঃ মার জন্যে বড়ই মন খারাপ হয়েছিল।

পুরোহিতের নিকট চিৎকারে আমার চমক ভাঙ্গল, রাজাকে সে কি বললে, রাজা টাঙ্গি বেশ করে বাগিয়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে পাঁটা আর ভেড়াগুলোকে কেটে ফেল্লে। তারপর আমায় হাঁটু গাড়িয়ে বসিয়ে, দুজনে দুধার থেকে আমার হাত লম্বা করে ধরে রইল। আমি দুর্গানাম জপ করতে লাগলাম। একবার পেছনে চেয়ে দেখলাম, রাজা আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আমায় লক্ষ্য করে, টাঙ্গি তুলে, রঙ্গ ভঙ্গ করে নাচতে নাচতে আসছে, ভাবলাম এইবার শেষ,

ভবের খেলা ফুরুল কেউ রক্ষে করলে না। হঠাৎ একটা মাভৈঃ মাভৈঃ চিৎকার শুনতে পেলাম, যারা আমায় ধরেছিল তারা হাত ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। রাজার হাতের টাঙ্গি খসে পড়ল। পুরুত বেটা আসন ছেড়ে দাঁড়াল। কে একজন আমার হাত ধরে তুলে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বল্লে "আমার সঙ্গে এস! কার সাধ্য মার ছেলেকে বলী দেয়?" চেয়ে দেখি দানাপুরের সেই সন্ন্যাসী। তারা সকলে যেন কাঠের পুতুলের মত নড়ন চড়ন হীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিতটা রেগে কি বলায়, সন্ন্যাসী তাকে সংস্কৃত কথায় বল্লেন "এ ব্যক্তি বলীর জন্য সৃষ্টি হয় নি, জগদম্বার কার্য্যের হয়েছে। এর এখনও পরীক্ষা চলছে, তোমরা দুঃখিত হয়ো না, অন্য সময় নরমাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক খেও। আমরা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলাম!

ষষ্ঠ অঙ্ক।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে অন্ধকারে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর হাতের নীচে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে বল্লাম বাবা আর চল্‌তে পারছি না, পা যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তিনি বল্লেন "আর বেশী দূর নেই, ঐ যে আগুন জ্বলছে দেখতে পাচ্ছ, এইখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে।" সেখানে পৌঁছে দেখি চারজন সাধু ধ্যানে বসে আছেন। আমরা তাদের কাছে বসলাম।

আমি। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন, আমার এ বিপদের বিষয়ই বা কেমন করে জানতে পারলেন?

সন্ন্যাসী। হেসে উত্তর করলেন "গুরুদত্ত যা কাজ পেয়েছি তাই করে

বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় বসে থাকবার যো নেই, কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি। খবর পেলেন কি করে?

সন্ন্যাসী। নিকটেই ছিলাম কি না, তাই তুমি যখন অধীর হয়ে কতকগুলো কটুকথা বল্‌ছিলে শুন্‌তে পেয়ে তোমার কাছে গিছলাম?

আমি। আমি মনে মনে বলেছি, চেঁচিয়ে ত বলি নি, আপনি শুনতে পেলেন কি করে?

সন্ন্যাসী। তোমার মনে নেই, চেঁচিয়ে না বল্‌লে কি শুন্‌তে পেয়েছিলাম।

আমি। হবে প্রাণের ভয়ে, কি করেছি, বলেছি মনে পড়ছে না। যদি কিছু কটু অপ্রিয় কথা বলে থাকি দয়া করে ক্ষমা করুন?

সন্ন্যাসী। ক্ষমা না করলে কি আর তোমায় উদ্ধার করতে যেতাম?

আমাদের কথাবার্ত্তা জেনে বোধ হয় যোগীদের ধ্যান ভেঙ্গে গেল, তাঁরা সন্ন্যাসীকে দেখে নমস্কারেব আদানপ্রদান কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাকরি হওয়ার পর একজন জিজ্ঞাসা করলেন "অনেকদিন আপনার চরণ দর্শন পাইনি, কোথায় ছিলেন?"

সন্ন্যাসী। এ তল্লাটেই ছিলাম না। আরো দিনকতক থাকব না, ঘুরতে হবে?

যোগী। শুকদেবের আদেশ?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ তাঁর এক প্রিয় শিষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার পড়েছে?

যোগী। লোকটি ত খুব ভাগ্যবান। তার জন্যে তিনি চিন্তিত।

সন্ন্যাসী। ভাগ্যবান বই কি, নইলে আমার কাজের ব্যাঘাত করে, তার কাছে হাজির থাকতে হয়েছে। ঐ আমার একরকম শাস্তি।

যোগী। শুকদেব এখন কোথায় আছেন বল্‌তে পারেন? তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার দরকার হয়েছে?

সন্ন্যাসী। হিমালয়ের উচ্চ শিখরে, পৌর্ণমাসী শিবের কাছে।

যোগী। বাবা! সেখানে যাওয়া আমাদের সাধ্য নয়। আপনি কি এর মধ্যে তাঁর কাছে যাবেন?

সন্ন্যাসী। যাওয়া না যাওয়া তাঁর ইচ্ছে। স্মরণ করলেই যেতে হবে?

যোগী। যদি যাওয়া হয়, দয়া করে আমার বিষয়টা তাঁকে মনে করে দেবেন কি?

সন্ন্যাসী। যদি স্মরণ করেন আর সে সময় ভুলিয়ে না দেন, বলব।

যোগী। যে আজ্ঞে। এখন আমাদের ওপর কিছু আদেশ আছে?

সন্ন্যাসী। এমন বিশেষ কিছু নেই, তবে এই লোকটিকে এই বর্ষা কমাস কোথায় রাখা যায় বল্‌তে পারেন?

যোগী। আমাদের কাছে রেখে যেতে পারেন কিন্তু এখানকার চেয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে থাকলে ওঁর সুবিধে হতে পারে, কেন না তাঁর অনেক শিষ্য আছে আর স্থানটাও এখানকার চেয়ে নিরাপদ।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছেন। তা'হলে আপনারা একজন কেও এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, আমার নাম করে বল্‌বেন যে বর্ষা কমাস তাঁর কাছে সাবধানে রাখেন। দীক্ষা বা উপদেশ দেবার আবশ্যক নেই। জগবন্ধু! আমি চল্লাম, তুমি এখন এঁদের কাছে থাক, এঁরা সুবিধামত তোমায় আর এক জায়গায় রেখে আসবেন। বর্ষাকালে কোথা সুবিধে

হবে না, বর্ষাটা, সেখানে কাটিয়ে ইচ্ছে হয় ত শীতটাও সেইখানে থেক ?

আমি। আপনার সঙ্গে কি আর দেখা হবে না ?

সন্ন্যাসী। মধ্যে মধ্যে হবে বৈ কি।

আমি। বেশ।

আমরা সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, মাথা তুলে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না, অন্তর্ধান হয়েছেন। যোগীদের মধ্যে একজন আমায় একটি গুহায় নিয়ে গিয়ে শুতে বললেন। আমিও দুর্গা বলে শুয়ে তখুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

দু'তিন দিন পরে একজন আমায় সঙ্গে করে পূর্ব্বদিকে তিনটি পাহাড় পার হয়ে একটি আশ্রমে নিয়ে এলেন, আমরা যখন আশ্রমে উপস্থিত হলাম তখন অপরাহ্ন। একটি বেল গাছের তলায় জটাজুটধারী একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটি হরিণ ছানাকে দুগ্ধ খাওয়াচ্ছিলেন, পাশে একটা বাঘের বাচ্ছা শুয়েছিল। মাথার ওপর গোটা দুই টিয়া পাখী সীতারাম, সীতারাম বলছিল ; চারিদিক শান্তিময়, হিংসা দ্বেষের লেশমাত্র নেই। নিকটে একটি ঝরণা—তার ধারে ধারে ডালিম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ আর বাদামের গাছ। বুনো গাছের ওপর আঙ্গুরের লতা উঠেছে, আঙ্গুরও যথেষ্ট ফলেছে। লতা পাতায় প্রায় আশিটি কুটীর ছাওয়া ; গরু ও মহিষ প্রায় দু'শো গাছতলায় শুয়ে আছে। সন্ন্যাসী আমাদের দেখে হেসে আদর করে "আও বাবা বৈঠ ?" আমার সঙ্গীকে তারপর কুছ্ বিঘ্ন হোতা নেহি ত ? আমার সঙ্গীটি বললেন "আপকা আশীষ সব সুন্দর ?"

বৃদ্ধ। বহুৎ আচ্ছা। কুছ্ খবর হ্যায় ?

যোগী। কালিকানন্দ স্বামী ইনকো আপকা আশ্রমমে রাখনে বলিন হ্যাঁয়, বৰা আওর জাড়া বাদ যাঁহা খুসী চল যায়েঁগে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন "বুঝে মালুম হ্যায় ?"

হিন্দী ছেড়ে সমস্ত কথোপকথন এইবার বাঙ্গলায় বোল্‌ব, তাতে পাঠকদের বোঝবার সুবিধে হবে। আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন "বাবা স্নান করে এসে কিছু খাও।"

আমি। আজ আর নাইব না; এখন কিছু খাবার ইচ্ছে নেই।

বৃদ্ধ। আচ্ছা; আমার শিষ্যেরা এখুনি আসবে, তাদের সঙ্গে ভাব করে নিও, বেশ থাকবে।

সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় এক এক করে প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্য এসে বৃদ্ধকে প্রণাম করে আপনার কুটীরে চল্‌ল। চার পাঁচটী স্ত্রীলোকও এসে তাঁকে প্রণাম করে নিজের নিজের কুঁড়েয় গেল। তাদের মধ্যে একটী অল্পবয়িসী ছিল, দেখতে শুনতে মন্দ নয়। যতগুলি শিষ্য ও শিষ্যা এসেছিল তাদের মধ্যে কেউ রোগা নয়, বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, নাদুস নুদুস আর প্রফুল্ল। বৃদ্ধ একজনকে ডেকে বল্লেন "তোমাদের যে কুটীরটি ভাল সেইটি এঁকে দাও আর ফল, মূল আর দুধ যথেষ্ট পরিমাণে দিও যেন দুবেলা খেতে পারেন।" শিষ্যটি "যে আজ্ঞে" বলে আমায় সঙ্গে করে একটি কুটীর দেখিয়ে দিলেন আর কতকগুলি ফল আর এক কমণ্ডলু দুধ দিলেন। সন্ধ্যের পর সমস্ত শিষ্যেরা বৃদ্ধের সুমুখে বসে গীতার ব্যাখ্যা শুনতে লাগল। আমিও তাঁদের সঙ্গে শুনলাম।

বর্ষা খুব পড়েছে, কুটীর থেকে বেরোবার যো নেই, সমস্ত দিন কুঁড়ের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হচ্ছে। যদিও এক একবার ধরছে তবুও সাহস করে বেরুতে পারছি না। দিন যেন আর কাটতে চায়

না, শুধু বসে থাকতে বড় বিরক্ত বোধ হতে লাগল, সঙ্গহীন একটা প্রধান কারণ। শিষ্যেরা কেওই দিনের বেলা আশ্রমে থাকে না, জলই হ'ক বা বজ্রাঘাতই হোক, তপস্যা বন্ধ হয় না, যথানিয়মে আর যথাসময়ে কাজ করতেই হবে। মাঝে মাঝে কেবল এক একটী স্ত্রীলোক কুঁড়েয় আসে সামনের কুঁড়েগুলি গোবর দিয়ে নিকিয়ে রাখে।

সপ্তম অঙ্ক।

এই রকম করে বসে দিন পনর কাটল। একদিন সকালে বৃষ্টি পড়ছে, চুপটি করে বসে আছি। সকলের চেয়ে বয়েসে ছোট স্ত্রীলোকটি অন্য কুটীরগুলি নিকিয়ে, হাসতে হাসতে আমার কুঁড়ের মধ্যে এসে বাইরে যেতে বল্লে। আমি বল্লাম "এত জলে কি বাইরে যাওয়া যায়? তুমি এক কাজ কর, আমি এক পাশে সরে বসছি, তুমি ঐ দিকটা নিকিয়ে নাও, তার পর ওদিকে সরে যাব, তখন এদিকটা নিকোবে, কেমন?" সে বেশ বলে নিকুতে লাগল। আমি গীতা পড়তে মন দিলাম।

স্ত্রী। তুমি তপস্যায় যাও না কেন?

আমি। আমার এখনও দীক্ষা হয় নি।

স্ত্রী। বাবার কাছে দীক্ষিত হলেই হয়।

আমি। বাবা আমায় শিষ্য করবেন না।

স্ত্রী। কেন করবেন না? বাবার কাছে কেও ত ফেরে না।

আমি। তা জানি না কেন, আমায় নেবেন না।

স্ত্রী। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন ?

আমি। যিনি আমায় এখানে রেখে যান, তিনিই বারণ করেছেন।

স্ত্রী। তুমি কত দিন বেরিয়েছ ?

আমি। ঠিক মনে নেই, মাস চার পাঁচ হবে।

স্ত্রী। তোমার বাপ মা বেঁচে আছেন ?

আমি। আছেন।

স্ত্রী। তোমার বৌ আছে ? বলিয়া মুচ্‌কি হাসিল। দুষ্টুমির হাসি বলিয়া মনে হইল।

আমি। আমি অবিবাহিত, এখন পর্য্যন্তও করি নি।

স্ত্রী। তোমার এত বয়েস হয়েছে এখনও বিয়ে হয় নি ? "আশ্চর্য্য ?" বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি। আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই ত।

স্ত্রী। আছে বৈ কি ? বাঙ্গালীদের যে এত বয়স পর্য্যন্ত হতে বাকী থাকে না। আমাদের বেনারসে দেখছি ত বাঙ্গালীদের ছেলে যোল সতেরয় পড়লেই বে হয়।

আমি। তোমার বাড়ী বুঝি বেনারসে ছিল ?

স্ত্রী। হ্যাঁ ; বাঙ্গালীরা বড় খারাপ লোক। আমার একজন বর ঠিক করেছিল।

আমি। এ ধারণা তোমার ভুল, সব বাঙ্গালী কি সমান ?

স্ত্রী। তা না হোক কিন্তু বাঙ্গালীরা বড় লম্পট।

আমি। এটাও তোমার ভুল ধারণা। আমায় কি লম্পট বলে বোধ হয় ?

স্ত্রীলোকটী হেসে বল্লে "তা হয় বৈ কি ? তোমার চোখ দুটোয় বিষ

মাখান রয়েছে। তোমায় যে দিন প্রথম দেখেছি, সেই দিন থেকে তোমায় ভাল লেগেছে, ভাল বেসেছি।"

আমি। সত্যি না কি? আমার আবার ধারণা অন্য রকম। তোমরাই ত পুরুষগুলোকে নষ্ট কর।

স্ত্রী। না আমরা খারাপ করি না, তোমরাই লোভ দেখিয়ে আমাদের মজাও।

আমি। লোভে না পড়লেই হয়।

স্ত্রী। চেষ্টা করা যায় বটে কিন্তু পারা যায় না। মন বড় খারাপ জিনিষ।

আমি। মনকে বশ করতে না পারলে সাধনা নিষ্ফল।

স্ত্রী। সব জানি। লোকালয় হোতে বনে পালিয়ে এলুম, তবু মন বশ হোল না।

আমি। তুমি কত দিন এসেছ?

স্ত্রী। বছর পাঁচেক।

আমি। তুমি জাতিতে কি?

স্ত্রী। তা বর্ণের উঁচু। ব্রাহ্মণী।

আমি। সংসারে তোমার কে আছেন?

স্ত্রী। যখন এসেছিলুম তখন সকলেই ছিলেন।

আমি। তোমার স্বামী বেঁচে আছেন? তুমি সধবা?

স্ত্রী। তখন ত ছিল।

আমি। তবে যোগিণী হবার কারণ কি?

স্ত্রী। বণিবনাও হোত না, মারধর করত। তাই চলে এসে-ছিলুম। বাবা আমায় মন্ত্র দিয়ে এখানে রেখেছেন। তোমার সঙ্গে গল্প

করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন তিন চারখানা বাকী আছে সেরে আসি। তুমিই আমার মাথা খেতে এসেছ বলিয়া প্রস্থান করলে! আমি কারণ জিজ্ঞাসা করবার জন্যে ডাকলাম কিন্তু সে পেছন ফিরে একটু হাসলে, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মানুষের ব্রহ্মাস্ত্র কটাক্ষ হেনে অন্য কুটীরে ঢুক্‌ল।

তার পর দিনও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, আমিও কুটীরে আবদ্ধ হয়ে গীতা পড়ছিলাম। স্ত্রীলোকটি সে দিনও তপস্যায় যায় নি। আমার কুঁড়েয় এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হচ্ছে মশায় ?"

আমি। গীতা পড়ছি। তুমি তপস্যায় যাও নি ?

স্ত্রী। তোমার জন্যেই যাওয়া হয় নি।

আমি। আমার জন্যে কেন ?

স্ত্রী। মন বসে না।

আমি। আচ্ছা কাল তুমি যে বলে গেলে, আমি তোমার মাথা খেতে এসেছি। তার মানে কি ?

স্ত্রী। মনে বুঝে দেখ। শরীরটে আজ ভাল নেই বলে যাই নি।

আমি। তবে আমার দোষ দিচ্ছিলে যে ?

স্ত্রী। তোমারই ত সম্পূর্ণ দোষ।

আমি। তোমার নামটি ত বল নি ?

স্ত্রী। মেয়ে মানুষের নাম শুনে কি করবে। আমার নাম লছমীণি।

আমি। বাজে কাজে মন দিও না। আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, তাদের মায়া কাটিয়ে, পরমার্থ চিন্তা করতে এসেছ, তাঁকে একান্ত মনে ভাব, পরমার্থের কাজ হবে, সিদ্ধি লাভ করবে।

স্ত্রী। এত দিন ত তাই করছিলুম, তুমিই কোথা থেকে এসে সব গোলমাল করে দিয়েছ।

আমি। গোলমাল হতে দেবে কেন? এতদিন যে খাটলে সবই পণ্ড হোল, কোন কাজেরই হয় নি। মন বশীভূত না করতে পারলে সবই বৃথা—ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে।

স্ত্রী। তা ত বুঝি, চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু ফল হচ্ছে না।

আমি। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে। প্রলোভনের হাত এড়াতে না পারলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

স্ত্রী। তুমি এখন আমার ভগবান। ধ্যানে, স্বপনে, চিন্তায় ভগবানের স্থান অধিকার করেছ।

আমি। ছিঃ—ওসব ভুলে শ্রীকৃষ্ণে মন দাও। পাপ পরিত্যাগ কর। তাঁকে ডাক, তিনিই তোমার মনে বল দেবেন।

স্ত্রী। চেষ্টা ত করছি, দেখি কতদূর কি হয়।

মুখখানা ভার করে উঠে গেল, মনে করে এসেছিল, আমার মত সুন্দরী কুমারীর ফাঁদে না পড়ে থাকতে পারবে না কিন্তু তা হোল না, ফেলতে পারলে না, নিজেই হেরে গেল। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। আমি বুঝতে পারলাম সে মনকে বশ করবার জন্য খুবই চেষ্টা করছে কিন্তু লালসা বশ হতে দিচ্ছে না, বরং যতই দমন করবার চেষ্টা করছে ততই কামনার বৃদ্ধি হচ্ছে। স্ত্রীলোকের স্বভাব, যদি কাউকে একবার প্রাণ দেয় সে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে প্রাণান্ত হতে হয়। তার জন্যে আমার বড় দুঃখ্যু হয়েছিল। একবার ভাবলাম, না হয় এখান থেকে চলে যাই, আমায় না দেখতে পেলে আপনি আমার চিন্তা ছাড়তে বাধ্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মন দিয়ে ভুলে যেতে পারবে। এই দারুণ বর্ষায় কোথাই বা যাই?

পাহাড়ে নদী সব পরিপূর্ণ; তা ছাড়া সাপ কোপেরও ভয় আছে। ভাবলাম যদি মোহন্তকে বলে দি, তিনি দমন করতে পারেন, হয় ত হিতে বিপরীত হবে। স্ত্রীলোকটার চরিত্রের ওপর আজীবন কলঙ্কের দাগ পড়ে থাকবে। আর আমাকে অভিসম্পাত করবে। বলা হবে না—বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে হবে।

বিকেলে বৃষ্টি ধরে গেল, মেঘও কেটে গেছে। আমি কুটীর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম গাছে যথেষ্ট আঙ্গুর পেকে রয়েছে। পেড়ে যত পারলাম খেলাম। কতকগুলো নিয়ে কুঁড়েয় এসে একটা কমণ্ডলুতে নিঙ্‌ড়ে রোদে রেখে দিলাম। লছমী একতাল সিদ্ধি এনে আমি খাব কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি অস্বীকার করে বললাম আমি সিদ্ধি খাই না। আমার সহ্য হয় না। সে আমায় আর অনুরোধ না করে কাছে নিয়ে গিয়ে আঙ্গুরের রসে গুলে তাঁকে দিলে। তিনি কিছু খেয়ে তাকে দিলেন, সে প্রসাদ পেলে। শিষ্যেরা তপস্যা করে এসে, প্রায় সকলেই সিদ্ধি খান। সেখানে অনেক সিদ্ধির গাছ ছিল, পাতা তুলে শুকিয়ে রেখে দেয় আর সন্ধ্যের সময় আঙ্গুরের কি ডালিমের রসে গুলে খায়। আমায় একদিন জেদ করে খাইয়েছিল; বড় উপাদেয় কিন্তু বড় বিশ্রী নেশা হয়, দুদিন ঘোর কাটেনি।

অষ্টম অঙ্ক।

দু' তিন দিন পরে সকাল থেকে বৃষ্টি হয় নি। আমি এক মুঠ কিস্‌মিস, গোটা দুই ডালিম, আধ সেরটাক দুধ খেয়ে বেড়াতে বেরুলাম। বর্ষাকালে যদি কেও পাহাড়ে ও বনে গিয়ে থাকেন, তিনিই বলতে

পারেন যে বনের কি মনোহর শোভা হয়। বনের শোভা আর পাখীর মধুর গান শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলাম, বাঘ ভাল্লুক গাছতলায় বেশ নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রয়েছে। হরিণ শৃগাল নির্ভয়ে তাদের পাছে পাছে চরছে। এখানে হিংস্র জন্তুরা হিংসে আর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রাগ কর্‌ছে। দেখে বড় আনন্দ হোল, আর তৎপ্রভাবে যে বন্যহিংস্রক জন্তুদের বশ কর্‌তে পারা যায় তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম বেলা পড়ে আসছে, কতদূর এসেছি আন্দাজ করতে পারলাম না। কাজেই আর না এগিয়ে আশ্রমমুখ হলাম। অনেকদূর চলে আসার পর, একটা শালবনের ভেতর ঢুক্‌লাম। প্রায় আধাআধি এসে দেখি লছমীনিয়া পদ্মাসনে বসে তপস্যা করছে। আমি তার কাছ থেকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাত তফাত দিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ সে আসন ভেঙ্গে দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে এই যে আমার দেবতা বর দিতে এসেছ? এস এইখানে বসি, আজ আর ছাড়ছি না ব'লে আমায় জোর করে বসালে আর নিজেও আমার গায়ে গা দিয়ে বসল। আমি তার ব্যাভার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিছলাম। এমন কি কথা কইবার ক্ষমতার লোপ পেয়েছিল। সে একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল "দেখ অনেক চেষ্টা করলুম, কিছুতেই তোমায় ভুলতে পারছি না, আমায় দয়া কর।"

আমি। দেখ, পরকাল নষ্ট কোর না, সতীত্বই তোমাদের পরম ধর্ম্ম? লালসার বশীভূত হয়ে তোমাদের সার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না?

লছমী। সতীত্ব পরম ধর্ম্ম আমাদের নয়। যারা ঘরে স্বামীর অধীনে আছে, তাদের।

আমি। অমন কথা বোল না। ঘরেই থাক আর বনেই থাক, সর্ব্বত্র সতীত্বের সমান আদর।

লছমী। হাজার বার বোল্‌ব। আমরা সংসারের বার, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের ইচ্ছাধীন।

আমি। পাগল আর কাকে বলে। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার ইচ্ছাধীন নয়, ঈশ্বরের নিয়ম আর শাসন সকলকেই মাথা হেঁট করে মানতেই হবে।

লছমী। ঈশ্বর কোন রকম বাঁধাবাঁধি নিয়ম করেন নি, যা করবার আমরাই করেছি। আমাদের যেটা সুবিধে সেইটে ধর্ম্ম আর যে কাজে আমাদের অসুবিধে আর স্বার্থহানি হয় সেইটে অধর্ম্ম। কেমন মান কিনা?

আমি। না—তোমার মতে আমি সায় দিতে পারলাম না। তুমি যা কামনা করছ আমি তা পারব না।

লছমী। তুমি আমার বাসনা পরিতৃপ্ত করবে না?

আমি। না—আমি অক্ষম আমায় ক্ষমা কর। আমি আজ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করিনি। আমি স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতৃজ্ঞান করি।

লছমী। তা করগে কিন্তু আমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে হবে।

আমি। তা কিছুতেই পারব না। আমি চির কৌমার্য্যব্রত নিয়েছি। আমার ব্রত ভঙ্গ করে পাপে মজতে পারি না। তুমিও সে চেষ্টা কোর না, পারবে না মনে মনে জ্বলে মরবে। তুমিও আমার মা, গর্ভ-ধারিণী মা। মা আমার গলা ছেড়ে দাও।

মাতৃসম্বোধন শুনে আমার গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে "তুমি যেমন আজ আমায় নিরাশ করলে, এমনি তোমাকেও নিরাশ হতে

হবে।” আমি মনে মনে হেসে চলে যাবার জন্তে যেমন দু চার পা এগিয়েছি, আমার কাঁধে কে হাত দিলে। আমি চমকে ফিরে দেখলাম আমাদের আশ্রমের প্রধান শিষ্য। হাসতে হাসতে বল্লেন “তোমার মনের জোর খুব, প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তুমি যখন এমন সব প্রলোভন গ্রাহ্য কর না, তখন সিদ্ধি তোমার করতলগত। আমি সমস্ত শুনেছি, তোমার আচরণে খুব আনন্দিত হয়েছি। মাগি-টাকে শাস্তি দিতে হবে। আশ্রমে যাবে নাকি। আমরা আশ্রমের দিকে পা বাড়ালাম। লছমী আমাদের আগেই চলে গেছ্‌ল।

সন্ধ্যের পর কুঁড়েয় বসে সন্ধ্যে করছি, একজন আমায় বল্লে “বাবা আপনাকে স্মরণ করেছেন।” আমি তাঁর কুঁড়েয় গিয়ে দেখ্‌লাম, তিনি আর তাঁর কজন শিষ্য বসে আছেন আর লছমী অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নমস্কার করলাম, আমায় বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন “এই স্ত্রীলোকটি তোমায় কি বলেছে ?”

আমি। সে সব নোংরা বিষয় আপনার গোচর করা অন্যায় হয়েছে। কে কোথায় হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, তা আপনার দেখা ভাল দেখায় না।

বৃদ্ধ। এ আশ্রমের ভার যখন আমার ওপর আর এতগুলি শিষ্যের ভালমন্দের জন্য আমি দায়ী, তখন কেমন করে চোখ বুজে থেকে ব্যভি-চারের প্রশ্রয় দি, কিছুতেই পারি না। কলুষিত আশ্রমে বাস করলে পাপের ভাগী হতে হয়।

আমি। আশ্রম কলুষিত হয়নি ত।

বৃদ্ধ। তোমার মনের বল আছে তাই হয় নি। যদি অন্য কোন লোককে ওর মতন সুন্দরী যুবতী, ঐ রকম যৌবন সমর্পন করতে যেত,

তা হলে সে কি উপভোগ না করে থাকতে পারত? কখনই নয়। তুমি বাবা সব খুলে বল?

আমি। বোলব আর কি, আপনি সব শুনেছেন ত?

বৃদ্ধ। যা শুনেছি সব সত্যি কিনা জানতে চাই—আর কতদিন ধরে ও তোমায় ফেলবার চেষ্টা করছিল?

আমি। আজ্ঞে,—সমস্তই সত্য বটে। বেশী দিন নয়, পাঁচ সাতদিন আগে থেকে ওর এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ও সাধ্যমত দমন করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নি, এখন যেমন অপদস্থ আর অপমানিত হয়েছে, তাতেই ওর খুব শাস্তি হয়েছে। দয়া করে ওকে যেতে দিন।

বৃদ্ধ। আমি পারি না বাবা। তুমি যখন অনুরোধ করছ তখন তাড়িয়ে দোব না, অন্যরকম শাস্তি দোব।

আমি। তাড়িয়ে দিলে ওর সমস্ত জীবনটা নষ্ট করা হবে, শুধু নষ্ট করা নয় পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

বৃদ্ধ। পাপের প্রশ্রয় কিসে দেওয়া হবে?

আমি। মনে করুন ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল, বাড়ী ফিরে যাবার পথ বন্ধ, কেন না ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে, ও এখন যায় কোথায়? এতদিন যে সৎপথে ছিল কেও বিশ্বাস করবে না, আর যদিই বা করে দাসীবৃত্তি করে উদর পোষণ করতে হবে। তাই বা ব্রাহ্মণের মেয়ে পারে কি করে? তা না পারলে বেশ্যাবৃত্তি ভিন্ন উদরান্নের যোগাড় করবার অন্য উপায় নেই। তা হলেই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হোল না কি? আপনিই পাপে লিপ্ত হবার জন্যই যেন বলে দিচ্ছেন, সে পাপ কার? অবিশ্যি আমার নয়, আপনারই। তাই আমি ওর হয়ে আপ-

নার দয়া ভিক্ষা করছি, ওকে তাড়িয়ে দেবেন না, অন্ত কোন শাস্তি দিন ?

বৃদ্ধ। তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত বটে। আচ্ছা ওকে এক বৎসরের জন্যে আশ্রম থেকে নির্ব্বাসন করলাম। ওর সঙ্গে আমার একজন শিষ্য আর একটি শিষ্যা থাকবে। হরিদ্বারে আর ত্রিবেণীতে মাথা মুড়ুবে। শিষ্যটি ত্রিবেণী থেকে ফিরে আসবে কিন্তু শিষ্যাটি বরাবর ওর চরিত্রের ওপর নজর রাখবার জন্যে ওর সঙ্গে থাকবে। এই এক বৎসরের মধ্যে ওকে ভিক্ষে করে পাঁচ শো টাকা জমাতে হবে। সেই টাকা সাধু সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারে দেওয়া হবে। কেমন এ শাস্তি কি বড্ড গুরুতর হোল ?

আমি। না—তবে ভিক্ষে করতে পারলে হয় ?

বৃদ্ধ দু জনের নাম বলে, দু এক দিনের মধ্যে যেতে আদেশ করলেন। স্ত্রীলোকটি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কিন্তু তিনি তাকে অনুরোধ করায় অগত্যা স্বীকৃত হোল।

তার পরদিন লছমী তপস্যায় যায় নি, আমি ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে দেখা করলাম। সে আমায় দেখে অধোবদনে বসে রইল। আমি তার কাছে গিয়ে বল্লাম "তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ ?"

লছমী। তোমার ওপর আমার আদপে রাগ হয় নি ? তুমি আমার মান বাঁচাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলে, আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই ও লোকটা শুনে গুরুদেবকে বলেছে। আমি যেখানেই যে অবস্থায় থাকি তোমায় ভুলতে পারব না।

আমি। সে সব ভুলে যাও। আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি কি ?

লছমী। কি উপকার করবে ?

আমি। তোমায় একখানা পত্র দোব, সেখানা যার নামে থাকবে, তাকে দিলে সে তখুনি তোমায় পাঁচ শো টাকা দেবে।

লছমী। লোকালয়ে গেলে টাকার ভাবনা নেই, ভিক্ষে করতে হবে না। মা যদি বেঁচে থাকেন আর তাঁর সঙ্গে যদি দেখা কত্তে পারি—পাচশো কেন হাজার টাকা পাব। যদি তিনি না বেঁচে থাকেন, আমার ভাইয়েরা দিতে পারে কিন্তু তাদের কাছে চাইব না, তুমি পত্র দিও, যদি কোথাও সুবিধে করতে না পারি, তা হলেই তোমার পত্রের ব্যবহার করব। কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি। কলকেতা, ভবানীপুর।

লছমী। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আবার যদি কেও দেখে বোল্‌বে পীরিত করছে।

আমি। ভাবলুম, আমি গ্রাহ্য করি না, আমরা খাঁটি আছি। কাগজ কলম কোথা পাই ?

লছমী "আমার কাছে আছে, দিচ্ছি—" বলে একখানা কাগজ আর দোয়াত কলম বার করে দিলে। আমি দাদাকে সমস্ত খবর দিয়ে, তাকে পাঁচশো টাকা দিতে অনুরোধ করলাম, আর অন্যান্য সংবাদ তার কাছে বাচনিক জানবার জন্যে লিখলাম।

পরদিন সকালে ওরা সকলে রওনা হোল। আমি তাদের সঙ্গে কিছুদুর গিয়ে ফিরে এলাম। আমি যতদুর তাদের সঙ্গে ছিলাম, সমস্ত পথটাই লছমী কেঁদেছিল। যেখান থেকে ফিরে এলাম, সেখানে সে আমার হাত দুটি ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "বাবুজি, যে কিছু দোষ করেছি, মাপ কোর, জীবনে আর দেখা হবার আশা নেই। মধ্যে

মধ্যে মনে কোর অভাগী তোমায় ভুলতে পারবে না।” আমি তাকে সান্ত্বনা করে বললাম “বেঁচে থাকলে দেখা হতে পারে ; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমায় শান্তি দিন।” সে আমায় প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল।

নবম অঙ্ক।

উপরোক্ত ঘটনার পর তিন চার মাস কেটে গেছে। শীতের আমেজ দিয়েছে—সকালে সন্ধ্যায় একটু গা শিড়শিড় করে। সন্ধ্যার পর ধুনীর কাছে বসে গীতা ব্যাখ্যা শুনছি, চারজন ঘোড়শওয়ার আশ্রমের কাছে নেমে, আমাদের কাছে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে হাতজোড় করে একজন বল্লে “মহারাণা আপনার আশীষ ভিক্ষা করেছেন আর একশোখানি কম্বল, সামান্য আটা, ঘী, চিনি পাঠিয়েছেন। মহারাজের যদি হুকুম হয় তা হলে এক দিন আপনার চরণ দর্শন করতে আসেন।

বৃদ্ধ। মহারাণা বড় ভক্ত, না হবে কেন, রাণা প্রতাপের বংশধর ত ? তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বোল যে দিন তাঁর ইচ্ছা হবে, আসতে পারেন। আমার কুটীর দ্বার তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সর্ব্বদাই খোলা আছে। তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?

অশ্বা। আজ্ঞে হয়েছে।

বৃদ্ধ। বেশ বিশ্রাম করগে ?

তারা আশ্রম থেকে একটু দূরে তাঁবু খাটাল। সন্ধ্যার সময় প্রায় ত্রিশজন ভারবাহী, কতকগুলি ঘোড়ার পিঠে ময়দা চিনি আর ঘী নিয়ে এল। এসেই একে একে সমস্ত নামিয়ে সাজিয়ে রাখলে। আমার

বোধ হয় প্রায় পঞ্চাশ মণ ময়দা আর চিনি, আর পঞ্চাশ টিন ঘী। বৃদ্ধ শিষ্যদের সমস্ত তুলতে আদেশ করবামাত্র. মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত তোলা হয়ে গেল। তিনি বল্লেন "আগামী পুর্ণিমায় সাধুদের নিমন্ত্রণ কর, আর তোমরা কাল থেকে তপস্যায় যেও না। দুগ্ধের দধি আর ক্ষীর তৈরী হোক, আর মিষ্টান্নাদি তৈরী করতে সুরু কর।' আমায় বল্লেন "বাবা! তুমি যত পার ফল মূল সংগ্রহ কর, আঙ্গুর পেড়ে রস করে বড় বড় জালায় রাখ।" এই রকম উপদেশ সকলকে দিলেন, প্রত্যেককে এক একটি কাজের ভার দেওয়া হল। আজ দ্বাদশী, সাধু ভোজনের তিন দিন মাত্র বাকী রইল।

আমি। কত লোক হবে বাবা!

বৃদ্ধ। হাজার বারশো সাধু আসবেন।

আমি। এত লোকের খাবার এত শীগ্‌গির তৈরী হয়ে উঠ্‌বে?

বৃদ্ধ। যাঁর কাজ তিনিই করবেন, আমাদের ভাববার দরকার নেই?

তার পরদিন পাহাড়ের গুহা থেকে বড় বড় কড়া হাঁড়ী বার করা হোল। বাণ কাটা হল, বড় বড় গামলায় ময়দা মাখা হতে লাগল, ভিয়ান চড়ে গেল। চার পাঁচ মণ দুধের দই বসান হল। আমি ফল মূল সংগ্রহ করতে লেগে গেলুম। ডালিম, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস পেড়ে স্তূপাকার করে ভাঁড়ারিকে দিলাম। আঙ্গুরের রস করে পাঁচটা জালায় পূর্ণ করে রাখলাম।

চতুর্দ্দশীর দিন রাণার লোকেরা বড় বড় তাঁবু খাটিয়ে প্রস্তুত করে রেখে দিলে। আমি ভেবেছিলাম সাধুদের জন্যে তাঁবু খাটান হয়েছে, কিন্তু সে ধারণা ভুল। সেই দিন সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় রাণা দল-

বলের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। তাঁবুতে যাবার পূর্ব্বে রাণীর সঙ্গে এসে বৃদ্ধকে বন্দনা করে বল্লেন "আরো যদি ঘী ময়দা আবশ্যক হয় আদেশ করবেন?" বৃদ্ধ তাঁকে আপ্যায়িত করে মিষ্ট কথায় বিদেয় দিলেন। দিনরাত পরিশ্রম করে পূর্ণিমার দিন বেলা দুটোর সময় সমস্ত প্রস্তুত হোল। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে সন্ধ্যের পর সন্ন্যাসীরা আসবেন।

পূর্ণিমার রাত্তির, শরৎকাল, রাণার তাঁবু থেকে বড় বড় শতরঞ্চি এনে পাতা হোল। সন্ন্যাসীরা আসতে আরম্ভ করলেন। কেও বা উলঙ্গ, কারো কৌপীন, কারো বা পশু চর্ম্ম, কারো বা গাছের ছাল পরা। তাঁদের মধ্যে অনেক যোগিনীও ছিলেন। বৃদ্ধ সকলকে সাদরে সম্ভাষণ করলেন ও বসতে বল্লেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন "আমাদের আজ স্মরণ করেছেন কেন?"

বৃদ্ধ। অনেক দিন আপনাদের চরণ দর্শন করি নি সেই জন্যে, অপরাধ ক্ষমা করবেন। উদয়পুরের ধর্ম্মপ্রাণ মহারাণা সাধু সেবার জন্যে কিছু ঘী ময়দা পাঠিয়েছেন, আর তিনিও মহারাণীর সঙ্গে এসেছেন, যদি অনুমতি হয় তিনি এসে আপনাদের চরণবন্দনা করে আশীর্ব্বাদ নেন।

সকলে অনুমোদন করলেন। বৃদ্ধ পুনরায় সকলকে আহ্বান করে বল্লেন—"আমি আগামী বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় দেহত্যাগ কোরব ইচ্ছা করেছি, আপনারা যদি অনুমতি করেন, তা হলে আমার প্রধান শিষ্যকে ভার দিয়ে একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করি।"

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন "কৈ আপনার সে শিষ্যটিকে দেখি?"

বৃদ্ধ বামানন্দ বলে ডাক্‌বা মাত্র তিনি উপস্থিত হয়ে নমস্কার করলেন। সকলে একবাক্যে বল্লেন "ও উপযুক্ত নয়। ও আপনার আসনে বসতে পারে না।" যিনি প্রথমে কথা বলেছিলেন তিনি বল্লেন "আপনি সিদ্ধ পুরুষ, অন্তর্য্যামি হয়ে কি বলে এমন প্রকৃতির লোককে আপনার আসনে বসাতে চাচ্ছেন। সুধু খল নয়, সাধনমার্গেও তত উন্নত নয়। এমন সময় আমার দানাপুরের সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়ে বল্লেন "ব্রহ্মানন্দ! তোমার এমন ভুল কেন হোল? যে লোকটাকে তোমার আশ্রমের ভার দিতে যাচ্ছ সে একেবারে তার অনুপযুক্ত।

জ্ঞানানন্দ। মাণিকানন্দ যা বল্লেন শুনলে ত? ও লোকটা লম্পট, অর্থাভিলাষী, ক্রূর। তোমার যে শিষ্যাটিকে নির্ব্বাসিত করেছ তার জন্যে ও পাগল। কতবার তার কাছে বাসনা চরিতার্থ করবার প্রস্তাব করেছে কিন্তু সে স্বীকৃতা হয় নি। সেই রাগে জগবন্ধুর সঙ্গে যা হয়েছিল তোমার গোচর করেছিল। তুমি যদি এখুনি ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও ওদিকে কি করতে গিছল। ওর তপস্যার স্থান দক্ষিণ বনে, তা হ'লে কতকটা তুমি বুঝতে পারতে। ও-রকম ভণ্ডকে এখুনি আশ্রম থেকে বার করে দাও। তুমি একবার যোগাসনে বসে ওর চরিত্র সম্বন্ধে দেখলে বুঝতে পারবে ও কি প্রকৃতির লোক। স্ত্রীলোকটার মনের কতদূর উদারতা দেখ, পাছে ওর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু শুনলে তুমি শাস্তি দেবে তাই সে কোন উচ্চবাচ্যই করে নি। তোমায় সেবায় আর খোসামোদে বশ করেছে। আর তুমি এমন বোকা একবার চোখ বুজলে সব জানতে পার, তা না করে তোমার আসন ওকে দিতে যাচ্ছ। তোমার সম্মান দেখে ওর অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, তোমায় কোনগতিকে সরিয়ে, রাজত্ব করে।

যা হোক তোমার অদৃষ্ট ভাল আর গুরুবল তাই আজ আমাদের কাছে এ প্রস্তাব তুলেছ।

ব্রহ্মা। যথার্থই আমার চোখ আবদ্ধ হ'য়ে ছিল। আপনার কথা শুনে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ও আশ্রমের উপযুক্ত নয়। রামানন্দ! তুমি বাপু আশ্রম পরিত্যাগ করে যাও। যাকে আশ্রমের ভার দি, আদেশ করুন।

কালিকানন্দ একজনকে আহ্বান করে বল্লেন "গৌরানন্দ! তুমি এ আশ্রমের ভার নাও।"

গৌরানন্দ হাত জোড় করে বল্লেন "গুরুদেব! দাসকে এ কঠিন শাস্তি কি অপরাধে দিচ্ছেন?"

কালি। সহাস্যে। শাস্তি নয় বৎস! শাস্তি। আমাদের আশ্রমের ভার কি যাকে তাকে দেওয়া যায়, না যে সে বইতে পারে? ব্রহ্মানন্দ! তুমি আমার চেয়ে বয়েসে ঢের ছোট, এরি মধ্যে দেহত্যাগ করবার সাধ হোল কেন?

ব্রহ্মা। দেহটা বড় অপটু হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই বদলাতে চাচ্ছি। শরীর এত দুর্ব্বল হয়েছে যে বেশীদূর হাঁটতে পারি না, কোন একটা শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারি না, এ অবস্থায় মিছে ভার বওয়া কেন?

কালি। তা বটে! তবু দিনকতক মিছিমিছি বইতে হবে। আর বিলম্ব করছ কেন, ভোগ দাও।

ব্রহ্মানন্দ। আমায় ডেকে বল্লেন, তুমি যেরূপ প্রস্তুত করেছ, সাধু বাবাদের জন্যে নিয়ে এস। আর সকলকে যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত হয়েছিল, আনতে বলে দাও। আমরা সামনে সমস্ত জিনিস বয়ে এনে

সাজিয়ে রাখলাম। সকলকে আঙ্গুরের রস দিতে গেলাম কিন্তু কেও ঢক ঢক করে আমাদের মতন খেলেন না, কেবল মাত্র কোড়ে আঙ্গুলটি ডুবিয়ে তুলে নিলেন।

ব্রহ্মানন্দ। গুরুদেবের পায়ের ধূল আশ্রমে পড়ল না, তিনি এলেন না কেন?

কালি। তাঁর ইচ্ছে। আমায় বল্লেন, তুমি যাও, আমি যাব না। উদয়পুরের রাণা পুত্র কামনায় সমস্ত জিনিস পাঠিয়েছে। সে জানে এত জিনিস ত সাধুবাবা ভাঁড়ারে পুঁজি করবেন না, নিশ্চয়ই সাধু-ভোজন হবে। রাজ চাল ছেড়েছে। সেও সস্ত্রীক এসেছে। নাও সাধু বাবাদের ভোগ দিতে বল; ঐ যে রাণা আসছে।

ব্রহ্মা। আপনারা দয়া করে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করুন।

যত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী উপস্থিত ছিলেন সকলে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে স্বাহা বলে, কালিকানন্দ আর গৌরানন্দ ব্যতিত, নিমন্ত্রিতগণ চক্ষুর নিমিষে অন্তর্ধান হলেন। মহারাণা সস্ত্রীক আশ্চর্যান্বিত হয়ে খাণিক দাঁড়িয়ে থেকে বল্লেন "সাধুবাবা ত ভোজন করলেন না।"

ব্রহ্মা। (সহাস্যে) কে বল্লে ভোজন করেন নি? ভাল করে দেখ দেখি, সামান্য প্রসাদ পড়ে আছে, আর সব উঠে গেছে।

বাস্তবিক, সেই পর্ব্বত-প্রমাণ খাদ্যদ্রব্য অন্তর্হিত হয়েছে। আমি দৌড়ে গিয়ে জালাগুলোর মধ্যে হাত দিয়ে দেখলাম কিছুই নেই, কেবলমাত্র একটিতে আধ জালা আন্দাজ আছে। পেস্তা, বাদাম, কিসমিস ও ডালিমের অবস্থাও তাই। আমি ফিরে এলে কালিকানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন "কি হে কি দেখলে?"

আমি। সামান্য একটু একটু পড়ে আছে আর সব খালি। আচ্ছা বাবা! ওঁরা খেলেন কখন?

কালি। তাঁরা কি আর তোমাদের মতন হাতে করে বসে বসে খান? তাঁদের ইচ্ছাতেই খাওয়া।

আমি। ভারী আশ্চর্য্য ত! তাঁরা এলেনই বা কেমন করে আর গেলেনই বা কি করে? তাঁদের আসা যাওয়া ত দেখতে পেলাম না।

কালি। একটা কথা শুনেছ "মনোরথ গতি" এঁদের তাই, ইচ্ছামাত্র কর্ম্ম হয়ে যায়। যেমন মনে হোল দিল্লী যাব অমনি সেখানে মুহূর্ত্ত মধ্যে গিয়ে পড়লেন। মহারাণা কিছু প্রসাদ নিয়ে যান। মহারাণী! আপনি এ প্রসাদের কিঞ্চিৎ ভক্তিপূর্ব্বক খাবেন, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। জগবন্ধু! মহারাণা আর মহারাণীকে প্রসাদ দাও।

আমি যথেষ্ট পরিমাণে পদ্মপাতায় প্রসাদ দুজনকেই দিলাম। মহারাণা উঞ্চিয়ে আর রাণী আঁচলে নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। মহারাণা বল্লেন "সাধু বাবাদের কই ভোজন করতে দেখতে পেলাম না ত।"

ব্রহ্মা। এ সব সাধু হাতে করে খান না। এঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই।

মহারাণা। আশ্চর্য্য! এ কথা আজ আমি প্রথম শুনলাম। যেন হাওয়ায় মিশে গেলেন।

ব্রহ্মা। তপপ্রভাবে কি হতে পারে স্বচক্ষে দেখলেন ত?

মহারাণা। দেখলাম বৈ কি, কেও যদি এর পূর্ব্বে আমায় বলত, আমি বিশ্বাস ত করতামই না, তা ছাড়া হয় ত তাকে উপহাস করতাম। এ যেন ভানুমতির বাজি, কল্পনাতেও আসে না।

ব্রহ্মা। কল্পনাতে না আসতে পারে কিন্তু স্বচক্ষে দেখলে ত? এঁদের যদি তোমার রাজত্ব দাও এঁরা অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেন,

গ্রাহ্য করেন না। যে রাজত্ব ভোগ এঁরা বনে বসে করছেন তোমরা কোটি কোটি জন্মে তা পাবে না।

মহারাণা। ভারী সুখ ত? না খেয়ে না দেয়ে, শুখিয়ে বাঘ ভালুকের মধ্যে প্রাণ হাতে করে বাবা, বড়ই রাজত্ব ভোগ করছেন। সুখ ভোগ করা অদেষ্টে থাকা চাই।

ব্রহ্মা। বাঘ ভালুককে তোমরা যেমন ভয় কর আমরা তা মোটেই করি না। ওদের আমরা শেয়াল কুকুর মনে করি। ওরা আমাদের কত বশীভূত দেখবে? আয়—আয়—বিশ পঁচিশটে বাঘ, ভালুক, সিংহ আয়।

তখন দলে দলে বাঘ ভালুক আর সিংহ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসে ব্রহ্মানন্দ আর কালিকানন্দের পায়ের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাণী "মা গো" বলে রাণার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কালিকানন্দ হাসতে হাসতে বল্লেন "মাজি! গোটাকতক বেঁধে দি—সঙ্গে করে নিয়ে যান।" রাণী হাত জোড় করে বল্লেন "ক্ষমা করুন বাবা! ভয়ে আমার গা কাঁপছে। আপনারা কেমন করে ওদের কাছে রয়েছেন? হিংস্র জন্তুকে বিশ্বাস কি?"

কালি। আমাদের ওরা হিংসে করবে না?

রাণী। আপনারা তা হলে যাদু করেছেন।

ব্রহ্মা। না মা! আমরা যাদু করি না, প্রেমে বশ হয়। আমরা যাদু টাদু জানি না। জানবার মধ্যে জানি একমাত্র সেই যাদুকরকে, যিনি দুনিয়াটাকে যাদু করে ভুলিয়ে রেখেছেন।

রাণী। আপনারা তাঁর যাদুতে বশ হন নি ত?

ব্রহ্মা। আগে ছিলাম কিন্তু তাঁর কৃপায়, এখন আর বশীভূত নই।

রাণা। আমাকে ঐ যাদু করা মন্ত্রটা শিখিয়ে দিতে পারবেন? রাণীকে বশ করি।

রাণী। রাণী বড় কম বশ কি না, তাই যাদু করবেন? ববং বাবা আমাকে দিন রাণাকে বশ করি।

কালি। এইবার রাণা বশ হবেন মা? বালকের মুখ দেখলে, রাণা আর কোথাও যাবেন না, কোন দিকে তাকাবেনও না।

রাণী। তাই আশীর্ব্বাদ করুন, বাবা!

ব্রহ্মা। আশীর্ব্বাদ ত করছি মা! রাণা প্রতাপের বংশধর ভারত-বাসীর গৌরব।

রাণা। অনুমতি হয় ত আমরা যাই।

ব্রহ্মা। আচ্ছা বাবা, যাবার আগে একবার দেখা কোর। আর একটা কথা বলে দি, এখানে শীকার করো না, আশ্রম অপবিত্র হবে।

রাণা। যে আজ্ঞে। যাবার আগে আপনাদের পায়ের ধূলা না নিয়ে কখনই যাব না। তাঁরা তাঁবুতে চলে গেলেন। ব্রহ্মানন্দ কালিকানন্দকে বল্লেন "আসুন কুটীরে যাই।"

কালি। কিছু আবশ্যক আছে নাকি?

ব্রহ্মা। না, একটু গল্প গুজব করা যাক্, আপনার দেখা ত হরদম পাওয়া যায় না।

কালি। আচ্ছা চল—তোমার শিষ্যদের প্রসাদ পেতে বলে দাও।

ব্রহ্মানন্দ শিষ্যদের প্রসাদ পেতে বলে কালিকানন্দের হাত ধরে কুটিরে প্রবেশ করলেন। কালিকানন্দ আমায় ডেকে বল্লেন,—"খেয়ে দেয়ে যেন তাঁর কুটীরে যাই। আমি 'যে আজ্ঞে' বলে যথেষ্ট পরিমাণে সমস্ত

নিয়ে কুটীরে বসে বেশ চোব্যচুষ্য করে খেলাম। সত্যি কথা বলতে গেলে, এরকম সুস্বাদু আর সুগন্ধ খাবার জীবনে কখন খাই নি, যত খাই ততই খেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু পেটে ধরে না। অনেক দিন পরে ঘি ময়দা পেটে পড়ল। খেয়ে যা বাকী রইল আবার পাঁচ দিন এই রকম গাণ্ডে পীণ্ডে খেতে পারব। সে গুলোকে বেশ যত্ন করে ঢাকা দিয়ে রাখলাম। তারপর পোয়াটাক আঙ্গুরের রস খেয়ে ফেললাম। আমি ত অনেক আঙ্গুরের রস খেয়েছি, কিন্তু সে যেন আর এক রকম, আর এ দিব্যি সুগন্ধ আর মিষ্টি, টকের লেশমাত্র নেই। এক ঘটী জল খেয়ে ব্রহ্মানন্দের কুঁড়েয় গিয়ে উপস্থিত হলাম। কালিকানন্দ হাসতে হাসতে বল্লেন "কি হে ভায়া চলতে পারছ না যে, একটু হাতে রেখে খেতে হয়? রসও অনেকটা খেয়েছ, ভাল করনি ভাই, হয়ত দুদিন উঠতে পারবে না। না পারলে বড়ই মুস্কিল হবে, যে খাবারগুলো সংগ্রহ করে রেখেছ তা খেতে পারবে না।"

আমি। আঙ্গুরের রস ত এক এক ভাঁড় খেয়েছি, কই তেমন বেশী নেসা হয় না ত।

কালি। তাতে হত না কিন্তু এতে খুবই হবে। যাক, এখানে ষ্টেশন আছে?

আমি। মন্দ নয়—তবে আবদ্ধ হয়ে বসে থাকতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, মনে করছি এইবার বেরিয়ে পড়ব।

কালি। শীতকালটা এখানে থেকে গেলে ভাল হবে। কেন না যদি কোন দিন আশ্রয় না পাও বড় কষ্ট পাবে।

আমি। যদি শীতে আশ্রয় বিনা কষ্ট পাই, তা হলে মার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাব।

কালি। তোমার ওপর মার দয়া যথেষ্ট আছে। আমাদের ওপর যদি ওর কণামাত্র থাকত আমরা ধন্য হতাম।

আমি। আপনাদের ওপর কম আছে বলেই ত বেঁচে আছেন, না ?

কালি। এতেই বোঝ না কেন, পাষাণের বেটী কত পাষাণী, বাঁচিয়ে রেখে কেবল কষ্ট দিচ্ছে বৈত নয়। যদি দয়া থাকত কোন দিন কোলে তুলে নিত, এমন করে ভবঘোরে ঘোরাত না।

আমি। তা বটে! যে ছেলেটা যত পায়, সে ততই চায়। সন্তুষ্ট কিছুতেই নয়।

কালি। আমরা কিছুই চাই না ভায়া—আমাদের দেবে কি ? যা চাই তা অনেকদিন আগে বিলিয়ে দিয়েছে।

আমি। এই যে বল্লেন, কোলে তুলে নিত।

কালি। সেটা কেবল কথার কথা। আমরা কামনায় আগুণ ধরিয়ে দিয়েছি।

আমি। আমি কবে পারব ?

কালি। গুরু জানেন। যাও শোওগে, বুঝতে পারছি তোমার বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

আমি। সত্যি কষ্ট হচ্ছে। এখন যেতে পারলে হয়—ইচ্ছে করছে এইখানেই লম্বা হই।

অতিকষ্টে দু তিনটে আছাড় খেয়ে টলতে টলতে কুটীরে এসে যেমন পড়া অমনি মড়া। তার পরদিন উঠতে খুব বেলা হয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গল সূর্য্যদেব তখন মাথার ওপর এসেছেন। উঠতে গেলাম পারলাম না, নেশা তখনও ভরপুর রয়েছে কিন্তু কোন অসুখ করেনি, খোঁয়ারি হয় নি। চক্ষু বুজে পড়ে রইলাম। কালিকানন্দ কুটীরে এসে গায়ে

হাত দিয়ে বল্লেন "উঠ না হে আর কত ঘুমুবে?" আশ্চর্য্য! আর কিছুমাত্র নেশা নেই, উঠে বসে প্রণাম করলাম। হেসে বল্লেন "চল একটু বেড়িয়ে আসি।" আমি চলুন বলে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকদূর গিয়ে গাছতলায় একটা পাথরের ওপর বসে, তাঁর পাশে আমায় বসিয়ে বল্লেন "জগবন্ধু! কেমন আছ, ক্ষিদে পায় নি?"

আমি। না এখনও পায় নি। যখন জ্ঞান হয়েছিল তখনও খুব নেশা ছিল, কিন্তু আপনি গায়ে হাত দেবামাত্র আর বুঝতে পারি নি। আর কতদিন ঘুরতে হবে?

কালি। গুরুদেব জানেন।

আমি। সে কি আপনি জানেন না?

কালি। না—আমায় যা আদেশ করেন, আমি তা পালন করি মাত্র।

আমি। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস্ করবেন কি?

কালি। করেছিলাম, বল্লেন, এখনও বিলম্ব আছে।

আমি। যদি বিলম্বই থাকে তা হলে এত তাড়াতাড়ি বার করে এনে কষ্ট না দিলেই পারতেন।

কালি। আনবার গূঢ় উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। তোমার ওপর তাঁর অসীম দয়া।

আমি। এমন দয়া যেন শত্রুকেও না করেন, তাঁকে বলবেন।

কালি। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

আমি। না কষ্ট হবে কেন—খুব সুখ হচ্ছে। কোন কাজকর্ম্ম নেই, বনে বনে টো টো করে ঘুরে বেড়ান, গাছের ফলে পেট ভরান, ঝরণার জলে তেষ্টা মেটান, পরনে কপনী, পায়ে জুত নেই, পাথরে

কাঁটায় পা, হাত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, এত সুখ সহ্য হবে কেন? খুব সুখে আছি। এক একবার ইচ্ছে হয় যদি একবার দেখা পাই, প্রাণ ভরে দুকথা শুনিয়ে দি। বুড় বাপ, মা, ভাই আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁর যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে তা বুদ্ধির অগম্য। যখন মার মুখখানা, বাবার স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা মনে পড়ে, যখন মনে হয় মা আমার জন্যে কত কাঁদছেন তখন প্রাণ ফেটে যায়, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। আপনারা মনে করছেন আমি খুব সুখে আছি।

কালি। যতদিন মায়ায় আচ্ছন্ন থাকবে, ততদিন একটু আধটু অসুখ বোধ হবে। হৃদয়কে পাষাণ না করতে পারলে পাষাণ-নন্দিনীর দেখা পাওয়া যায় না।

আমি। পাষাণ-নন্দিনীকে পাবার আশা আছে নাকি?

কালি। পাবার আশা আছে কি—পেয়েছ ত। যে বুড়ী রসগোল্লা খাইয়েছিল সে বুড়ী কে—চিন্তে পার নি?

আমি। চিনতে না দিলে চিনব কি করে? ছলনা না করলে কি তৃপ্তি হয় না?

কালি। চিন্দিয়ে দিতে হবে? চোখ বুজে থাকলে কেমন করে দেখতে পাবে?

আমি। চোখের ঠুলিটা খুলে দিয়ে চিনিয়ে দিন। আমার আর ভাল লাগছে না।

কালি। আমার যদি ক্ষমতা থাকত কোন্‌কালে তোমায় চিনিয়ে দিতাম। তুমি যে আমার সীমার অনেক উঁচুতে। তুমি যেখানকার সেখানে আমাদের জারিজুরী খাটে না ভাই, আমাদের মাথা বাঁধা রয়েছে।

আমি। আমি যাঁর আসামী তাঁর কাছে হাজির করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হউন না ?

কালি। তাঁর যেদিন হুকুম হবে, তুমি আপনি গিয়ে হাজির হবে, কাউকে নিয়ে যেতে হবে না।

আমি। আপনার যদি কোন ক্ষমতা নেই, তা হলে আমার বিষয় নিয়ে আপনি কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন।

কালি। সাধে কি ঘামাচ্ছি, পেয়াদার ঠেলায়। তোমার বিষয় তাঁর জপমালা হয়েছে।

আমি। বটে ! সেইজন্যে নিজে ডহর পাণিতে থেকে পোলারে চর পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, ভগবান কি আপনাদের সোজা পথে চলতে বারণ করেছেন ?

কালি। আমরা বাঁকা পথে চলি না. সোজা বড় ভালবাসি।

আমি। বাঁকা নয় ? যিনি আমায় এত নিগ্রহ করছেন, তাঁকে এ পর্য্যন্ত একবার চোখের দেখাও দেখতে পাই নি। জানি না তিনি কাল কি গোরা. হাত পা ওয়ালা কি জড়।

কালি। তিনি তোমায় খুব স্নেহ করেন। তিনি জড় নন, খুব সচেতন। তুমি সর্ব্বদা তাঁর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছ।

আমি। আর কাজ নেই মশায় তাঁর স্নেহে। বনে বনে ঘোরবার সখ মিটেছে, আজি রাণার কাছে গিয়ে চাকরী নিয়ে তাঁর সঙ্গে চলে যাব।

কালি। যেতে পারবে না।

আমি। কেন পারব না, খুব পারব।

কালি। হয় তোমার মত বদলে যাবে, নয় রাণা তোমায় নেবে না।

আমি। আচ্ছা দেখি কি হয়। চলুন আশ্রমে যাওয়া যাক।

কালি। আমি আর যাব না, তুমি যাও।

যেমন বলা অমনি অদৃশ্য হওয়া। আমি ওদের এই রকম দেখে দেখে একরকম অভ্যস্থ হয়েছিলাম তাই আশ্চর্য্য হলাম না। আমি আশ্রমমুখো হলাম। ভাবতে ভাবতে চলেছি, যিনি আমায় এমন করে নাকে দড়ী দিয়ে ঘোরাচ্ছেন তিনি নিশ্চয়ই দেবতা। রাণার কাছে যাব কিনা? যদি একবার তাঁর দেখা পেতাম, তা হলে মনের কথা তাঁকে জানাতাম, জানাবারই দরকার কি, তিনি যেখানে থাকুন আমার মনের কথা জানতে বাকী নেই, তিনি ত অন্তর্য্যামী। পথে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা হবামাত্র বল্লেন "জগবন্ধু! রামানন্দ ভাঁড়ার থেকে সমস্ত ধনরত্ন আর জনকয়েককে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে, কি করা যায়, বল দেখি?"

আমি। মহারাণাকে খবর দিলে তিনি অনায়াসে ধরিয়ে আনতে পারেন।

ব্রহ্মানন্দ। চল, দেখি কি হয়?

আমরা তাঁবুর কাছে যাবামাত্র প্রহরীরা প্রণাম করে খবর দেবামাত্র, রাণা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাইরে এসে হাত জোড় করে বল্লেন "দাসকে কিছু আদেশ আছে কি?" আমি তাঁকে সমস্ত খুলে বললাম। রাগে তাঁর বড় বড় চোখ দুটো ভাঁটার মত ঘুরতে লাগল। তখনি চারজন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিকদের তাদের সন্ধানে পাঠিয়ে বলে দিলেন, "সন্ন্যাসী বলে যেন তাদের ওপর কোন রকম দয়া করা না হয়, যে অবস্থায় আর যেখানে পাবে বেঁধে নিয়ে আসবে।" আমি বল্লাম "মহারাজ আপনার অশ্বারোহীরা যে পথে গেল তারা যদি সেদিকে না গিয়ে থাকে, তা হলে তাদের ধরতে পারবে না, আমার মতে এইদিকে জনকতককে পাঠিয়ে

দিন।” রাণা আমার কথা সমীচিন বিবেচনা করে আরো চারজনকে সেই পথে পাঠিয়ে আমাদের তাঁবুর ভেতর যাবার জন্যে আহ্বান করলেন।

ব্রহ্মা। আমি আর যাব না। দেখ, ধনরত্নের জন্যে আমার দুঃখ হয় নি, আমার স্বহস্তলিখিত একখানা গ্রন্থ নিয়ে গেছে, সেইখানির জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে। গ্রন্থখানিতে সাধনার অনেক গুপ্তরহস্য আছে, সেখানি আমার। তাদের কোন কাজে লাগবে না, তত বিদ্যে তাদের নেই। রামানন্দকে বড় স্নেহ করতাম, দু একটা তাকে শিখিয়েছিলাম। সেই গ্রন্থ দেখে ভাল না করতে পারবে, লোকের অনিষ্ট করতে পারবে।

তিনি আশ্রমে গেলেন, আমি রাণার সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে একখানা আসনে বসলাম, রাণা আমার কাছে বসে বল্লেন “আদেশ করুন কি করব?”

আমি। আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

রাণা। বেশ ত, চলুন। কেন, এ আর ভাল লাগছে না বুঝি?

আমি। হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে চাকরী করতে ইচ্ছে করি। আমি ডাক্তারি পাস করে গভর্ণমেন্টের চাকরী করছিলাম। একটা সন্ন্যাসীর বাক্‌চাতুরীতে ভুলে, চলে এসেছিলাম। এখন আর আমার এ পথে থাকতে ইচ্ছে নেই।

রাণা। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। একজন ইংরাজি লেখাপড়া জানা লোক আমার দরকার আছে, আমি দু একজনকে সে কথা বলেছি। আপনি ডাক্তার, আমার দপ্তরে কাজ করতে পারবেন ত?

আমি। খুব পারব। আমি সর্ব্বোচ্চ ইংরাজি পরীক্ষা পাস করে, মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়ে সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি কচ্ছিলাম।

রাণা। বেশ, আপনার কত মাইনে ছিল ?

আমি। দু'শো।

রাণা। আপনি রাজসরকার থেকে পাঁচ শো পাবেন। আর যখন ডাক্তারখানা খোলা হবে তখন হাজার টাকা মাসহারা পাবেন। সরকার থেকে চাকর, বাড়ী আর চৌকি পাবেন।

আমি। যে আজ্ঞে, কবে যাবেন ?

রাণা। আমরা ইচ্ছে করেছি পরশু যাব। আপনার আর আশ্রমে যাবার আবশ্যক নেই, এখানে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কৈ হ্যায় দেয়ানজীকো ভেজ।

চার পাঁচ মিনিট পরেই একটি বৃদ্ধ এসে অভিবাদন করলেন। তাঁকে আমার জন্যে কাপড় চোপড়, দাসদাসী আর একটি আলাদা তাঁবু দিতে হুকুম দিয়ে বল্লেন "এঁকে আমার খাসদপ্তরের জন্যে পাঁচশো টাকায় নিয়েছি, আপনি এঁর পদমর্য্যাদা মত পোষাক পরিচ্ছদ দিন। বৃদ্ধ তাঁর আদেশ শুনে অবাক হয়ে খানিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, হাত জোড় করে বল্লেন "মহারাণা, অপরাধ মার্জ্জনা হয় ত, কিছু বলতে ইচ্ছে করি।" রাণা ঘাড় নেড়ে অনুমতি দিলে তিনি বল্লেন "সাধু বাবা চাকরি করবেন না, রহস্য করছেন।" রাণা আমার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি স্থাপন করলেন।

আমি। দেওয়ান সাহেব, আমি সাধু নই, সত্যিই আমি চাকরি করব।

রাণা। উনি আমায় সমস্ত বলেছেন, তাই আমি চাকরি দিয়েছি। আপনি ওঁকে নিয়ে গিয়ে ওঁর যা যা দরকার সব বন্দোবস্ত করে দিন।

আমি রাণাকে আশীর্ব্বাদ করে দেওয়ানের সঙ্গে গেলাম। তিনি

তাঁর একজন চাকরকে কাপড় চোপড় আনতে আদেশ করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চুলদাড়ী কামাবো কিনা। আমি কাল কামাব বলায় আর একজনকে বল্লেন যে রাণার পেছনে যে তাঁবু আছে সেখানে নিয়ে যেতে আর আমায় কাপড় চোপড় পরে সন্ধ্যার পর দেখা করতে বল্লেন। পাঁচশো টাকার চাকরি পেয়েও কিন্তু আমার মন প্রফুল্ল হল না। ভাবলাম মাত্রাটা কি ভাল করলাম? কোথায় স্বর্গসুখ আর মোক্ষ পাবার আশায় ঘর ছেড়ে এলাম, না আবার সেই নরক ভোগ করতে যাচ্ছি। একেবারে মন খারাপ হয়ে গেল। পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে একজন চাকর রেখে গেল। মনে ভাবলাম, আজ আর পরব না, কাল পরব। মন বড় হটকট করতে লাগল। খাঁচায় পোরা বুন পাখী যেমন ছটফট করে, পালাবার পথ খোঁজে, আমারও মন তেমনি ছটফট করতে লাগল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, ছুটে বেরিয়ে একেবারে আশ্রমে আমার কুটীরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, আর খানিকটা আঙ্গুরের রস খেলাম। ব্রহ্মানন্দ আমাকে অমন করে ছুটে আসতে দেখে, জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? আমি তাঁকে সব খুলে বল্লাম, তিনি হেসে বল্লেন "ভাইরে! তোমায় দাসত্ব করবার জন্যে জগদম্বা ভবে পাঠান নি। অবিশ্যি তোমার মনে কষ্ট হতে পারে যে এতদিন ঘুরে বেড়ালাম অথচ কোন কাজ হল না। কি করবে বল—সময় না হলে ত দীক্ষা হবে না। যিনি আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, তিনি তোমায় যথেষ্ট ভালবাসেন, বোধ হয় তোমার মত কেহ আর কাওকে করেন না। তুমি তাঁর প্রিয় শিষ্য। তোমায় দেখবার জন্যে একজন সিদ্ধ পুরুষকে, তার তপস্যা ছাড়িয়ে তোমার সঙ্গে রেখেছেন। কালিকানন্দ অলক্ষ্যেতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি রাণার সঙ্গে যা

কথাবার্ত্তা কয়েছ, গুরুদেব তখুনি জানতে পেরে মনে মনে হেসেছেন'। যাক্, এখন কিছু আহার করে বিশ্রাম কর কাল সকালে না হয় রাণার কাছে যেও। রামানন্দ দল শুদ্ধ ধরা পড়েছে।

আমি। তাদের কি এখানে এনেছে?

ব্রহ্মা। না এখন আসে নি, রাত্রে এসে পৌঁছুবে। আমি চললাম।

আমার তখন বেশ নেশা হয়েছে, কিছু খাবার বার করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। যেমন শোয়া অমনি অচৈতন্য। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখ্লাম, যেন সাক্ষাৎ শিব, ছবিতে যেমন দেখ্তে পাওয়া যায়, আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে মধুরস্বরে হাসতে হাসতে বলছেন "জগবন্ধু! বাপ আমার, আমায় দেখবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিস, এই দেখ আমি এসেছি। এখনও আমার মানব-দেহ দেখবার সময় হয় নি, সময় হলে আমি কি থাকতে পারব? তোকে বুকে নেবার জন্যে আমারও মন বড় চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু কি করব, তোর কর্ম্মফল যতদিন না খণ্ডন হবে ততদিন আমি দেখা দিতে পারব না। কাজ করতে পারছিস না বলে বড় উতলা হয়েছিস, এ মন্ত্রটা জপ করিস মন ঠাণ্ডা হবে।" চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখি কাকস্য পরিবেদনা পড়ে পড়ে স্বপ্নের কথা ভাবছি, পাখী ডেকে উঠ্ল, আমি ত দুর্গা শ্রীহরি বলে শয্যা ছেড়ে কুটীরের বাইরে এলাম। ব্রহ্মানন্দ আমায় দেখে হেসে বল্লেন "ভায়া গুরুদেবকে দেখ্লে?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে মনে মনে ভাবলাম "এর সঙ্গে কি দেখা হয়েছে, ইনি কেমন করে জানতে পারলেন?" আমি তা হলে স্বপ্ন দেখি নি, সত্যি ত গুরুদেব্ এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার সঙ্গে কি তাঁর দেখা হয়েছে?"

• ব্রহ্মা। দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। তোমার কল্যাণে অনেক দিন পরে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পেলাম।

আমি। আমি মনে করছিলাম স্বপ্ন দেখছি, তা নয় সত্যসত্যই তিনি এসেছিলেন।

ব্রহ্মা। সত্যই এসেছিলেন, তোমারই জন্যে এসেছিলেন। তোমার মত ভাগ্যবান খুব কম লোকই আছে।

মহারাণা দেওয়ানের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের কুটীরে এসে উপস্থিত হ'য়ে স্বামীজিকে প্রণাম করে আমায় হাসতে হাসতে বললেন "বাবুজি কাল পালিয়ে এলেন কেন?"

ব্রহ্মা। তুমি কি মনে কর, মহারাজও তোমার চাকরী করবে? তা যদি হ'ত তা হ'লে ওকে এ বনের ভিতর দেখতে পেতে না। জগবন্ধু মহামায়ার সেবার জন্য ভবে এসেছে।

রাণা। আমি জানি বাবা, যে কোপ্‌নী পরেছে সে কখন কাপড় পরতে রাজী হবে না। আপনার শিষ্যদের ধরে আনা হয়েছে, অনুমতি হয় ত তাদের এখানে আনাই।

ব্রহ্মা। আমার কাছে আনতে হবে না। যে সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করেছে সব পাওয়া গেছে।

দেওয়ান। তাদের কাছে যা ছিল সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ব্রহ্মা। তার মধ্যে একখানা গ্রন্থ পেয়েছ কি?

দাওয়ান। একখানা কেন, চার পাঁচখানা হাতে লেখা পুঁথি তাদের কাছে পাওয়া গেছে।

ব্রহ্মা। কৈ নিয়ে এস দেখি?

দাওয়ান তখনি গিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটুলী আর চার পাঁচখানা

পুঁথি এনে তার হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তার মধ্য থেকে একখানা বার করে নিয়ে বাকিগুলি আমার হাতে দিয়ে তাঁর কুটীরে রাখতে বলে, নিজে পুঁটলিটি নিয়ে আহারে গেলেন। যাবার সময় রাণাকে বল্লেন—"মহারাজ একটু অপেক্ষা কোর?"

রাণা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবুজী! আমার সঙ্গে যাবেন না?"

আমি। কি ক'রে যাই বলুন? এদের চক্র থেকে বেরোন বড় শক্ত! আমার যাওয়া হবে না।

রাণা। গেলে কিন্তু ভাল করতেন। সন্ন্যাসাশ্রমের কষ্ট আপনার সহ্য হবে না।

আমি। না পারলে ছাড়ে কৈ?

রাণা। আপনি এঁদের সঙ্গে মিশে ভাল করেন নি।

আমি। ইচ্ছা করে কি মিশছি, মহারাজ?

রাণা। জোর করে ধরে এনেছে না কি?

আমি। তাই বা বলি কি ক'রে, যাদু করেছে।

রাণা। তাই ত বোধ হচ্ছে।

ব্রহ্মানন্দ ভাড়ার থেকে ফিরে এসে বল্লেন "কিছুই নষ্ট করে নি।"

রাণা। ওদের নিয়ে কি করব?

ব্রহ্মা। তোমার বিচারে যা হয় করগে।

রাণা। আমার বিচারে ওদের কারাবাস হওয়া উচিত।

ব্রহ্মা। তোমাদের আইনে যদি কারাবাস শাস্তি হয়, দাওগে, আমার আপত্তি নেই।

রাণা। যে আজ্ঞে। যদি অনুমতি হয় ত তাঁবু তুলতে বলি।

ব্রহ্মা। আচ্ছা। আর একটা কথা, শীত আসছে, খানকতক কম্বল পাঠালে ভাল হয়।

রাণা। দাওয়ানজি! রাজধানীতে গিয়েই একশোখানা ভাল কম্বল পাঠিয়ে দেবেন।

দেওয়ান। যে আজ্ঞে।

মহারাণা ও দেওয়ান প্রণাম করে তাঁবুর দিকে গেলেন। ব্রহ্মানন্দ আমায় বল্লেন "জগবন্ধু! আমার সঙ্গে এস, ঠাকুর তোমায় কিছু উপদেশ দিতে বলেছেন।"

আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর কুটীরে গেলাম।

দশম অঙ্ক

সে দিন আমার মন খুব প্রফুল্ল ছিল। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় রাণা দলবলে স্বামীজীর পাদবন্দনা করে, আমার কাছে এসে পায়ের ধূল নিয়ে বল্লেন "বাবা, যদি কখন কোন রকম সাহায্যের আবশ্যক হয়, আমায় আদেশ করবেন।" আমি প্রতিশ্রুত হ'লে তিনি রাজধানীতে ফিরে গেলেন। আমিও একটু বেড়াতে বেরুলাম। খানিকদূর গিয়ে দেখি, এক জায়গায় প্রায় তিরিশ কি চল্লিশটা বাঘ বসে রয়েছে, বসবার কায়দা আছে। তিনটে এক দিকে পায়ের উপর ভর দিয়ে থাবা গেড়ে বসে আছে, আর তাদের ঠিক সুমুখে, সার দিয়ে এক পংক্তিতে সবগুলো সেই রকম করে থাবা গেড়ে বসে ল্যাজ আছড়াচ্ছে। একটু পরে একটা প্রকাণ্ড বাঘ উঠে যেখানে তিনটে

বসেছিল, সেখানে গিয়ে একটার গা চাটতে লাগল। তাই না দেখে দলের ভিতর থেকে ছুটো গা ঝাড়া দিয়ে দৌড়ে গিয়ে যেটা গা চাটছিল, তার ঘাড় কামড়ে ধরলে। যেমন কামড়ান অমনি ফিরে তাকে আক্রমণ করা, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। একা একা যুদ্ধ, এ যুদ্ধ না দেখলে বোঝান বড় শক্ত। খানিক যুদ্ধ করে, যেটা কামড়েছিল, সেটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালাল। অপরটা ঠিক বিজয়ী বীরের মতন এক হাত জিভ বার করে দলের দিকে তাকিয়ে পায়চারী করতে লাগল, যেন বলছে কার সাহস আছে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আর একটা এসে লেগে গেল, কিন্তু তাকে পালাতে হোল না, সেইখানে পড়ে গেল। বিজয়ী বাঘটা তার পেট চিরে নাড়ী ভুঁড়ী বার করে, যুদ্ধস্থলের বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে, পায়চারী করতে লাগল, কিন্তু বেশীক্ষণ বেড়াতে পারলে না, আর একটা এসে আক্রমণ করলে। আবার যুদ্ধ বাধল, এরা কেন যে আপনা আপনি যুদ্ধ করছে তখনও বুঝতে পারি নি। সে ভীম গর্জ্জন শুনলে পিলে চমকে ওঠে। এটাও ভয়ে একদিকে পালাল। এবার একটা এমন বাঘ এসে নামল, যা ঐ বাঘটা তিনটেকে হারিয়েছে বোধ হয় তার চেয়ে বড় আর বলিষ্ঠ। সেটা এমন ভয়ানক বিকট চেঁচালে যে চারিদিকে প্রতিধ্বনি হল ও সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করলে। বিজয়ী বার টলমল করতে লাগল। তার এক চড় আর কামড় খেয়ে চলে পড়ল। যে তাকে হারালে সে তার একটা পা দাঁতে করে ধরে হিঁচড়ে একপাশে টেনে ফেলে দিয়ে রণস্থল পরিষ্কার করে, সেই তিনটের কাছে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র, দল থেকে একটা বেরিয়ে এসে তার গালে থাবড়া মারলে, সেও চক্ষের নিমিষে ফিরে লেগে গেল কিন্তু বেশীক্ষণ যুঝতে পারলে না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। একে

একে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর যুদ্ধ করে, কেউ হয় মল নয় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। প্রায় চার ঘণ্টা এই রকম ভীষণ যুদ্ধ হল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত পাহাড়ের উপর বসে দেখতে লাগলাম। শেষে একটা চার পাঁচটাকে হারিয়ে, বাকী যে তিন. চারটে ছিল তাদের তাড়া করলে, তারা তত বলিষ্ঠ ছিল না বোধ হয়, তাড়া খেয়ে ল্যাজ উঁচু করে ভোঁ দৌড়। যখন দেখলে আর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তখন সে সেই তিনটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, একটা উঠে এসে তার গায়ের রক্ত চাটতে লাগল। অন্য দুটোও তার কাছে এসে ডান পাটা তুলে তার মাথায় দিলে, সেও মাথা হেঁট করে আশীর্ব্বাদ নিলে। তারপর যেটা তার গায়ের রক্ত চাটছিল তার সঙ্গে একদিকে চলে গেল। আমি আশ্রমে ফিরে এসে জানলাম যে বাঘের বিয়ে ঐ রকম করে হয়, যে সব গুলোকে হারাতে পারবে সেই বাঘিনীকে পাবে। এ যেন আমাদের পূর্ব্বকালের স্বয়ম্বরা।

শীতটা কোন রকমে কেটে গেল। ফাগুনের হাওয়া পড়বামাত্র আমার মন সেখান থেকে যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। একদিন ব্রহ্মানন্দকে বল্লাম, "আর এখানে মন টিকছে না, কাল সকালে যাব।" তিনি শুনে বড় দুঃখিত হয়ে বল্লেন "দু তিন দিন পরেই দোল, যদি একান্ত না থাক দোল দেখে যেও। হয়ত গুরুদেব ও আসতে পারেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি একান্তই যদি না আসেন কালিকানন্দ নিশ্চয় আসবেন, দেখা করে না গেলে তাঁরা দুঃখিত হবেন। আমার ইচ্ছে টোঁ টোঁ করে ঘুরে না বেড়িয়ে এক জায়গায় স্থির থাক।" আমি আর তাঁর কথা ঠেলতে না পেরে দোল দেখবার জন্য রয়ে গেলাম।

দোলের আয়োজন খুব চলতে লাগল। উদয়পুর থেকে ঘি ময়দা,

চিনি এসেছে। শিষ্যেরা সকলে মিলে খাবার তৈরী করতে লাগল। আমার উপর গতবারের মত ফলমূল সংগ্রহ করবার ভার পড়ল। আমি আঙ্গুর পেড়ে রস করে জালা ভর্ত্তী করতে আরম্ভ করলাম। রাণা খবর পাঠিয়েছেন—সম্ভবতঃ তিনি পূর্ণিমার দিন আসতে পারেন। দোলমঞ্চ তৈরী হয়ে ফুল পাতা দিয়ে সাজান হোল। আশ্রমের সুমুখে এক জায়গায় স্তূপাকার করে কাঠ সাজান হল. প্রথমটা কারণ বুঝতে পারি নি, পরে শুনলাম হুলকা জালান হবে, অর্থাৎ চাঁচর হবে। বেলা পড়তে না পড়তে সমস্ত প্রস্তুত হয়ে গেল। বেশীর মধ্যে এবার ছানার মালপো যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যের একটু আগে দু বস্তা ফাগ ভাঁড়ার থেকে বার করা হল। সকাল থেকে খুব গান বাজনা হচ্ছিল সকলে আমোদে মত্ত হল। সন্ধ্যের সময় ব্রহ্মানন্দ শিষ্যদের গান বাজনা বন্ধ করতে বল্লেন. সাধুদের আবির্ভাবের সময় হয়েছে, রাণা এলেন না।

সন্ধ্যের পর থেকে সাধুদের আবির্ভাব হতে লাগল, এক প্রহরের মধ্যে নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হলেন। আমি ব্রহ্মানন্দের কাছে কাছে ঘুরতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, যদি গুরুদেব আসেন দর্শন পাব। আমি ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞেস করলাম "দোলমঞ্চ ত তৈরী হয়েছে, ঠাকুর কৈ, কার পূজো হবে?" ব্রহ্মানন্দ হেসে বল্লেন "ঠাকুরকে আহ্বান করতে হবে, তিনি দোলমঞ্চে আবির্ভাব হবেন।" এমন সময় কে আমার পেছন থেকে কাঁধে হাত দিলেন, আমি ফিরে দেখি কালিকানন্দ। তিনি সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন "কেমন আছ, মন ঠাণ্ডা হয়েছে ত?" আমি শুধু একটু হাসলাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন "ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

আমি। স্বপ্নে দেখেছিলাম, সে দেখা মঞ্জুর নয়।

কালি। তাত নয়ই।

ব্রহ্মা। ঠাকুর আসবেন বলেছিলেন, বলতে পারেন, আসবেন কি না?

কালি। সন্ধ্যের আগে আমায় বলেছিলেন, কৈলাশে যাবেন, এদিকে বোধ হয় আসছেন না।

ব্রহ্মা। তিনি যদি না আসেন, এরকম বোধ হয়, তবে বিলম্ব করবার আবশ্যক কি?

কালি। আমি ত কোন আবশ্যক দেখি না।

ব্রহ্মা। কে কৃষ্ণকে আহ্বান করবেন?

কালি। সমবেত সাধুদের জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রহ্মানন্দ সকলকে উদ্দেশ করে বল্লেন "আপনারা কেউ এসে ভগবানের পূজা করুন।" তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন "পূজা করবার উপযুক্ত এক কালিকানন্দ স্বামী ভিন্ন আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই, তিনিই ঠাকুরকে আহ্বান করে পূজা করুন। ব্রহ্মানন্দ কালিকানন্দকে পূজা করতে অনুরোধ করলেন। তিনি জয় গুরু বলে প্রথমে হুলকায় আগুণ দিলেন, আগুণ বেশ ধরে উঠলে তিনি সেই আগুণ করলেন। তারপর মঞ্চের কাছে বসলেন, মিনিট দুই পরে, একবারে মাটী ছেড়ে মঞ্চের সামনে উঠলেন। সেই অবস্থায় মিনিট দশেক থেকে, আবার মাটিতে নেবে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে বস্তা থেকে এক মুঠ ফাগ নিয়ে মঞ্চের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে 'জয় নারায়ণ শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদি স্তব পাঠ করতে লাগলেন, সকলে সমস্বরে ঐ স্তবটি পাঠ করতে করতে দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে এক এক মুঠ ফাগ

দিতে লাগলেন। সকলের দেওয়া শেষ হলে কালিকানন্দ একমুঠ ফাগ আমার হাতে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের পায়ে দিতে বল্লেন। আমি মঞ্চের কাছে গিয়ে ছোঁড়বার জন্তে যেমন হাত তুলেছি, অমনি একজন ফস্ করে আমার হাত ধরে বল্লেন "আওর নীচে", আমিও হাত নীচু করে ছুঁড়লাম, ঠিক যেন অন্ধকারে ঢিল মারা হলো। কালিকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন "কি দেখলে হে?" আমি বল্লাম "কিছুই না।"

কালি। রাধাকৃষ্ণের পায়ে ঠিক পড়েছে, তোমার ফাগ নারায়ণ হাতে করে নিয়েছেন, তুমি ভাই বড় ভাগ্যবান। ওহে ব্রহ্মানন্দ, ভোগের ব্যবস্থা কর, শ্রীমধুসূদন খাবার জন্তে বড় ব্যস্ত হয়েছেন যে?

ব্রহ্মানন্দ শিষ্যদের ভোগ সাজাতে আদেশ করলেন, শিষ্যেরাও মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সাজিয়ে দিলে, আমিও ফল, মূল, আঙ্গুরের রসের জালা এনে রাখলাম। কালিকানন্দ সমস্ত নিবেদন করে প্রণাম করলেন। তার দেখাদেখি সকলে প্রণাম করলেন। তারপর সকলে আপনাদের মধ্যে ফাগ ছড়াছড়ি করে, জালার মধ্যে হাত দিয়ে এক এক ফোঁটা রস মুখে দিয়ে, ব্রহ্মানন্দ আর কালিকানন্দকে নমস্কার করে উঠে গেলেন। ব্রহ্মানন্দ কালিকানন্দকে সঙ্গে করে নিজের কুটীরে গেলেন। কালিকানন্দ আমায় ডেকে বল্লেন "এস হে বন্ধু, একসঙ্গে প্রসাদ পাইগে।"

আমিও তাঁদের সঙ্গে কুটিরে গিয়ে ঢুকলাম। এতদিন আমি আশ্রমে আছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের কুটীরে কখন ঢুকি নি। কুটীরের মেঝেয় বাঁশের চেটাই পাতা, তার ওপর কম্বল, কম্বলের ওপর আধখানা খুব পুরু গালচে, তার ওপর গেরুয়া ছোপান রঙ্গিন কাপড়। বেড়ার ধারে বড় বড় তাকিয়ায় রেশমী কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া। ঢুকলেই

কেমন একটা সৌগন্ধ পাওয়া যায়। কুটিরের ভেতর কোন আলোকাধার দেখতে পেলাম না, কিন্তু খুব আলো হয়েছে। চারিদিকে দেখতে দেখতে বেড়ার গা থেকে আলো আসছে দেখে কাছে গিয়ে দেখলাম একটা লম্বা পাথরের ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। হাতে নিয়ে বুঝতে পারলাম এ সেই পাথর যা একদিন বুড়ার কুটীরে দেখেছিলাম। তাঁরা আমার কাণ্ড দেখে হাসছিলেন। কালিকানন্দ হাসতে হাসতে বল্লেন "ভায়া! ওটা নেবে?" আমি বল্লাম "নিয়ে কি করব?"

কালি। ওটা পেলে তুমি খুব বড়লোক হবে। সাত রাজার ধন এক মাণিক জান ত?

আমি। জানি। বড়লোক হবার ইচ্ছে থাকলে, অনেকদিন আগে ও পেয়েছিলাম, নিয়ে নগরে গেলেই হত।

কালি। বড়লোক হবার ইচ্ছে নেই?

আমি। ধনী, অর্থাৎ অর্থে বড় লোক হবার ইচ্ছে নেই।

ব্রহ্মা। তবে কি রকম বড়লোক হবার ইচ্ছে?

আমি। সাধারণ লোকের চেয়ে বড় হবার ইচ্ছে।

ব্রহ্মানন্দ একজন শিষ্যকে খাবার আনতে বলবামাত্র সে একখানি রূপোর থালায় সবরকম খাবার রেখে গেল। আমরা তিনজনে খেতে বসলাম। এমন সুস্বাদু আর সুগন্ধ খাবার জন্মে খাই নি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশী খেতে পারলাম না। তারপর এক এক পাত্র আঙ্গুর রস খেলাম। আমার কিন্তু এক পাত্রে কুলাল না, তিন পাত্র খেলাম।

ব্রহ্মা। আমি বড় আশা করেছিলাম ঠাকুর আসবেন।

কালি। তাঁর আসবার যো নেই। তোমার দেহত্যাগ সম্বন্ধে

তাঁকে বলেছিলাম, তিনি খুব হাসলেন আর বল্লেন "এরি মধ্যে খোলস বদলানর দরকার হল কেন?" আমি বল্লাম "তার দেহটা বড় অপটু হয়েছে তাই?"

ব্রহ্মা। যাবার আগে তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

আমার অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে আসতে লাগল, বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি তাঁদের বলে নিজের কুঁড়েয় গিয়ে যেমন শোয়া অমনি অজ্ঞান। তার পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি প্রায় বেলা এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে কিছু খাবার খেয়ে বেড়াতে বেরুলাম। এদিকে আগে কখনও যাই নি, তাই যাবার ইচ্ছে হল। খানিক দূর গিয়ে বোধ হল যেন একটা বাড়ী রয়েছে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কাছে গিয়ে একটা পাথরের বাড়ী দেখতে পেলাম। বাড়ীটার স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গেছে, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় গাছ জন্মেছে। বাড়ীর পেছনে একটা ডোবার মত ছিল, জল খুব পরিষ্কার যেন কাকের চক্ষু। বাড়ীর ভেতর কেউ আছে বলে বোধ হয় নি। ঘুরে সুমুখে গেলাম, দরজায় চাবি বন্ধ দেখে আশ্চর্য্য হলাম। দরজাটা নূতন বলে বোধ হল, কেন না বাড়ীটা যে রকম পুরাণো, তাতে দরজা ভাঙ্গাচোরা হওয়া উচিত ছিল। সন্দেহ হওয়ায় চারিধারে ঘুরে দেখলাম, যদি কোন সন্ধান পাই কিন্তু কিছুই পেলাম না। জানালা ছিল না, শুধু ঘরে হাওয়া যাবার জন্যে খুব উঁচুতে একটা গোল গর্ত্ত ছিল। চেষ্টা করলাম যদি ভেতরে কি আছে দেখতে পাই, নিকটে একটা বড় শালগাছ ছিল, উঠলাম কিন্তু ভেতরে নজর চলল না। দূরে একটা লোক ঝুড়ি মাথায় করে আসছে দেখতে পেয়ে, গাছ থেকে নেমে কাছেই একটা তেঁতুল গাছে উঠে লুকিয়ে রইলাম। লোকটা বরাবর বাড়ীর কাছে

এসে চারিদিক দেখে মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে আবার চারিদিক দেখে চাবি খুলে ঝুড়িটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, খুব মোটা সোটা, ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মত কুটীলতা মাখান, এমন ভ্রষমন চেহারা আমি জীবনে দেখি নি। হঠাৎ দেখলে যমদূত বলে ভ্রম হয়। গাছে বসে শুনতে পেলাম লোকটা খুব চেঁচিয়ে বলছে, "আমাদের কথা মত যতদিন কাজ না করবে ততদিন তোমার এইখানে বন্ধ থাকতে হবে, মনে করেছ শঙ্কর সিং তোমায় উদ্ধার করবে, তা হচ্ছে না। তোমায় এখানে রাখা হয়েছে, কেউ আজীবন খুঁজে বার করতে পারবে না।" আর কিছু শুনতে পেলাম না বটে। কিন্তু বোধ হল আর একজন যেন বললে। একটু পরে সেই লোকটা একটা কলসী নিয়ে ডোবা থেকে জল ভরে আবার ঘরে ঢুকে বল্লে "এক কলসী জলে যদি না হয় আমার সঙ্গে এস, বাইরের খাদে নেয়ে আসবে।" চল বলে একটী স্ত্রীলোক আধ ঘোমটা দিয়ে তার সঙ্গে ডোবার কাছে এসে বল্লে "আঃ বাঁচলাম, সূর্য্যের মুখ দেখে প্রাণ জুড়ুল, তুমি একটু সরে যাও আমি নেয়ে নি।" লোকটা সরে এসে একটা গাছতলায় এমন ভাবে বসল, যে স্ত্রীলোকটী উঠবামাত্র দেখতে পায়। স্ত্রীলোকটার বয়স সতের আঠারর বেশী হবে না, খুব সুশ্রী, রংটি দুধে আলতায় গোলা, মুখটি শুখিয়ে গেছে, চোখ দুটি বেশ বড় বড় কিন্তু ফোলা, বোধ হয় খুব কেঁদেছে, তাই ফোলা, চুল খুব লম্বা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পড়েছে। বড় ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয়। আমি বুঝলাম কেউ তাকে বন্দিনী করে রেখেছে। আমার ইচ্ছে হল নেমে তার পরিচয় নি, কিন্তু ঐ লোকটার ভয়ে সাহস হল না। লোকটা হেঁকে বল্লে "আর বেশী দেরী করো না, উঠে এস, তারা যদি জানতে

পারে তা হলে গান মন্দ করবে।" স্ত্রীলোকটি তার কথা শুনে ভিজে কাপড়ে উঠে এসে ঘরে ঢুকল। একটু পরে সে লোকটা ঘরের ভেতর থেকে খালি ঝুড়িটা বার করে এনে তালা বন্ধ করে চলে গেল।

সে যখন অদৃশ্য হল আমি গাছ থেকে নেমে দোরের কাছে গিয়ে বল্লাম "আমার বোধ হচ্ছে তোমায় কেউ ধরে এনে আবদ্ধ করে রেখেছে, আমি তোমায় উদ্ধার করতে ইচ্ছে করি।" সে বল্লে "আপনি যেই হোন, আমায় উদ্ধার করুন, আপনি যা চাইবেন আপনাকে তাই দোব।" আমি জিজ্ঞেস করলাম "লোকটা আবার কখন আসবে ?"

স্ত্রী। রাত্রি এক প্রহরের সময় এসে সমস্ত রাত্তির থাকে, সকালে আমার জন্যে খাবার আনতে যায়।

"যদি পারি আজি তোমায় উদ্ধার করব" বলে আমি বরাবর আশ্রমে এলাম। আশ্রমে ফিরে আসতে প্রায় তৃতীয় প্রহর হল। একটু বিশ্রাম করে ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বলে কেমন করে তাকে উদ্ধার করা যায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন "তুমি ত ভাই একা কিছু করতে পারবে না, এরা সব ফিরে আসুন, তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

সন্ধ্যের একটু পূর্ব্বে চারজন ঘোড়সওয়ার রাণার কাছ থেকে একখানা পত্র আর কিছু ঘী ময়দা নিয়ে এল। তারা আসবামাত্র ব্রহ্মানন্দ আমায় ডেকে বল্লেন "এই দেখ ভাই নারায়ণ সেই স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করবার জন্যে সশস্ত্র প্রহরী পাঠিয়েছেন। তুমি এদের আর আমাদের চার পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, দলে যত পুরু হও ততই ভাল।" তিনি তাদের প্রধানকে ডেকে সব বললেন। সে শুনে বল্লে "একে খুঁজে বার করবার জন্যে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, আর তাদের

দলকে ধরিয়ে দিতে পারলে আরো দু হাজার টাকা বকসিস্ পাওয়া যাবে। ভাল, আমরা যাব, এখান থেকে কতদূর যেতে হবে ?

আমি। বেশী দূর নয়, ক্রোশ দুয়ের মধ্যে।

প্রহরী। তা হলে সন্ধ্যার পর একটু অন্ধকার হলে যাওয়া যাবে, সে লোকটাকে ধরা চাই, কেন না তার কাছে তাদের দলের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যের পর আমরা বারজনে বেরুলাম। আমাদের আশ্রম থেকে সাতজন বলিষ্ঠ লোক বেছে নেওয়া গেল, তারা এক একটা কুড়ুল আর বর্শা নিলে। আমরা এক প্রহরের পরে সেখানে পৌঁছিলাম। সামনের দিকে বোধ হল তিন চারজন লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে; আমি তাদের বললাম "তোমরা পেছনে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি ঠিক সময়ে তোমাদের নিয়ে যাব।" চারজনের মধ্যে তিনজন ঘরে ঢুকল, আর এক-জন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাদের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে খবর দিলাম। তারা দু দিক দিয়ে এসে প্রথমে বাইরের লোকটাকে ধরে বেঁধে ফেললে, কিন্তু সহজে পারে নি, বেশ একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয়েছিল। ভেতরে যারা ছিল তারা বাইরে বেরিয়েই আবার ঘরের ভেতর ঢুকে দোর বন্ধ করবার উপক্রম করবামাত্র আমাদের দুজন ঘোড়-সওয়ার ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে তলোয়ার খুলে দাঁড়াল, তারাও ফস্ করে কোমর থেকে ছোরা বার করলে। আমাদের একজন বললে "ভাল চাস্ ত ধরা দে, নইলে আমাদের দু একজন জখম হবে বটে, তোদের কিন্তু প্রাণ বাঁচান ভার হবে। তোরা মনে করিস্ না যে আমরা সবে দুটি, বাইরে আমাদের আরও লোক আছে। ভৈরো সিং, ওঝা সিং ভেতরে এস। তারা ভেতরে ঢুকেই বর্শা তুলে বলে "ছোরা ফেলে দে,

নইলে গেঁথে ফেলব।" তাদের একজন প্রহরীদের একজনকে ছোরা মারবার উদ্দেশে লাফিয়ে তার ওপর পড়বার আগেই সর্দার প্রহরী তার হাতে তলোয়ারের আঘাত করলে, কব্জির আধখানা কেটে গিয়ে হাতের ছোরা খসে পড়ল। অন্য দুজন লোক দেখলে সুবিধে নয়, ধরা দেওয়াই ভাল, ছোরা ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের লোকেরা তাদের বেঁধে বাইরে নিয়ে এল। আমি স্ত্রীলোকটিকে বল্লম "মা তোমায় উদ্ধার করতে পেরেছি আমার সঙ্গে এস।" সে গায়ে একখানা ওড়না দিয়ে আমার সঙ্গে বাইরে এল। আমরা তাদের ভালো করে বেঁধে প্রায় রাত্তির শেষ হয়, এমন সময়ে আশ্রমে এলাম। তাদের একটি গুহার মধ্যে আবদ্ধ করে দুজন পাহারায় রইল। স্ত্রীলোকটিকে আমাদের আশ্রমের মেয়েদের কাছে রাখা হল। আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম, এক চুমুক রস খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠতে একটু বেলা হয়েছিল। কুটীরের বাইরে এসে দেখলাম সে সকলকে নিয়ে ব্রহ্মানন্দের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মানন্দ তাদের রাজ-দরবারে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "স্ত্রীলোকটিকে কি জন্যে আটক করেছিল, বলেছেন কি?"

ব্রহ্মা। সে সব বিষয় আমাদের জানবার দরকার কি?

আমি। আছে বৈ কি, জেনে রাখা ভাল। কারণ কি, বল ত মা?

স্ত্রী। যে লোকটির হাত কাটা গেছে, উনি আমার খুড়—বাবা মরবার সময় তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমায় দিয়ে যান। তিনি যে দিন মারা যান, সেই দিন আমাকে শশুর বাড়ী থেকে আনাবার জন্যে ওঁকে বলেন, তিনি আনতে পাঠালাম বলে বাবাকে প্রবোধ দেন কিন্তু লোক পাঠান নি। বাবা মারা যাবার পাঁচ ছ দিন পরে খবর পেলাম

তিনি অত্যন্ত পীড়িত। আমি আমার একজন জ্ঞাতি দেওরকে সঙ্গে নিয়ে বাবাকে দেখতে এলাম। আসতে আসতে পথেই খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন। আমার দেওর বল্লে আর সেখানে গিয়ে কি হবে চল ঘরে ফিরে যাই। আমি কিন্তু তার কথা না শুনে বাপের বাড়ী এলাম। আমাদের বাড়ীতে কাকা তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমি চাবি চাইতে বললেন তুই সেখানে ত একলা থাকতে পারবি না, আমাদের বাড়ীতেই থাক। আমি বল্লাম না আমি থাকতে পারব তুমি চাবি দাও, আমি ত বেশী দিন থাকব না, তাঁর কাজ কর্ম্ম হয়ে গেলেই চলে যাব। আমি সেইখানেই থাকিগে, তা ছাড়া আমার সঙ্গে আমার দেওর আর চাকরাণী এসেছে, তাদের নিয়ে তোমরা কেন বিব্রত হবে? তিনি কিন্তু কিছুতেই চাবি দিতে চান না, নানা রকম ওজর আপত্তি করতে লাগলেন, আমি যখন বল্লাম যদি চাবি না দাও আমি তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকব, তখন রাগ করে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম সমস্ত জিনিষ পত্র ওলটপালট হয়ে রয়েছে। সে গুলকে গুছিয়ে, সিন্দুক খুলে দেখলাম কাগজ পত্র সব তছ-নছ-করা। তাঁর অনেক নগদ টাকা ছিল কিছুই নেই। তিনি সোণা রূপার গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতেন, সে সবও কিছুই নেই। কাকাকে জিজ্ঞাসা করার তিনি বললেন আমি জানি না। তাই শুনে আমার শশুর বাড়ী খবর দিলাম, সেখান থেকে আমার শ্বশুর এসে কাকাকে বল্লেন "যদি ভাল চাও ত বার কর, নইলে আমি কোতওয়ালিতে খবর দোব।" কাকা একটু ইতঃস্তত করে বল্লেন আমি যা কিছু নিয়েছি তা দাদা আমায় দিয়ে গেছেন। শশুর জিজ্ঞেস করলেন কিছু লেখা পড়া আছে? কাকা বল্লেন না, তবে যখন তিনি আমায় বলেন তখন সেখানে দু একজন লোক ছিল, তারা সাক্ষী

দেবে। শশুর বল্লেন তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বা মেয়েকে দান করেছেন, তা জানেন কি ? যদি স্বনামে সব ফিরে না দেন আমি আদালত করব। আদালতের নাম শুনে বল্লেন না—না—তা করতে হবে না আপোষে মিটিয়ে নেওয়া যাবে, তাঁর কাজটা হয়ে যাক। শশুর বল্লেন "কাল আমার একটা মোকদ্দমা আছে, সদরে যেতে হবে, ফিরতে চার পাঁচ দিন দেরী হবে। তত দিনে তাঁর কাজ কর্ম্মও মিটে যাবে ফিরে এসে যা হয় করা যাবে। তার পর তিনি চলে গেলেন, বাবারও কাজকর্ম্ম সব মিটে গেল। কাজ কর্ম্ম শেষ হওয়ার পর রাত্রি বারটা কি একটার সময় চার পাঁচ জন লোক দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে আমায় এখানে ধরে নিয়ে এল। তার পর একখানা কাগজ এনে আমায় সই করতে বল্লে, আমি অস্বীকার করায় ভয় দেখিয়ে বল্লে যতদিন আমি সই না করব ততদিন আমায় এখানে আটক থাকতে হবে। একদিন একটি মেয়ে মানুষ এসেছিল সে আমায় সই করতে বারণ করেছিল আর বলেছিল আমি সই করলেই আমায় মেরে ফেলবে। তার কথা শুনে সকলেরই খুব রাগ হয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ বললেন আর বিলম্ব করছ কেন, তোমরা যাও! তারা যাবার সময় আমায় জিজ্ঞাস করলে আমি সেখানে থাকব কি না ? কারণ জিজ্ঞাস করে অবগত হলাম যে, আমার সাক্ষ্য দরকার হতে পারে। আমি তাদের আমার বক্তব্য ইংরাজিতে লিখে দিলাম। তারা সকলকে নিয়ে চলে গেল।

একাদশ অঙ্ক ;

দিন দুই পরে আমি ব্রহ্মানন্দকে বলে সেখান থেকে বেরিয়ে বরাবর পূর্ব্বমুখে পাহাড়ে পাহাড়ে যেতে লাগলাম। রাত্তিরে গুহায় থাকি আর দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরি আর বনের ফল খাই। ফলের মধ্যে আবার অনেক বিষাক্ত আছে। আমি কিন্তু যে ফল পাখীতে খেয়েছে বা খাচ্ছে দেখতাম তাই খেতাম কিম্বা যে সব ফল আগে খেয়েছি তাই খেতাম। মাস দুই এমনি করে কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যের সময় গুহা খুঁজতে খুঁজতে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম। তিনি খুব আদর করে তাঁর গুহায় নিয়ে গিয়ে কিছু ফলমূল খেতে দিলেন কিন্তু বলে দিলেন না, বল্লেন "নিকটেই ঝরণা খেয়ে এস।"

আমি। আপনার কমণ্ডলুতে জল নেই?

সন্ন্যাসী। আছে—আমার ছোঁয়া জল খাবে কি? আমি মুসলমান।

আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে বললাম "আপনি মুসলমান? একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন "বলুন না—অত সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

আমি। আপনাকে কি মুসলমানে দীক্ষিত করেছেন?

সন্ন্যাসী। না বাবা—একজন মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ আমায় দয়া করেছেন।

আমি। তিনি কোথায় থাকেন?

সন্ন্যাসী। তা জানি না তবে মধ্যে মধ্যে দয়া করে দর্শন দেন।

আমি। তাঁর নাম নিশ্চয়ই জানেন।

সন্ন্যাসী। তাঁর নাম কখন জিজ্ঞাসা করি নি জানি না। তাঁর লম্বা পাকা গোঁপ দাড়ি আছে, দেখতেও বেশ সুপুরুষ।

আমি। আপনি নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে, আমাদের দেবতার সাধনা করছেন খুব আশ্চর্য্য ?

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য কিছুই নয়। দেবতা আপনারও নন আমারও নন যে ভজে তারই। কি পাপ করেছিলাম তাই ম্লেচ্ছ হয়ে এসেছি, গুরুদেব কৃপা করে উদ্ধার করেছেন।

আমি। এই অন্ধকারে আর ঝরণায় যাব না, আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই, যখন সাহেবদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেয়েছি তখন আপনার জল খেতে কোন দোষ দেখি না।

সন্ন্যাসী। আপনি কোন দোষ না দেখলেও, আমি কিন্তু দিতে পারি না। আমার হাত কাঁপ্‌চে।

"খুব দিতে পার বাবা ওনি আমার ভাই" বলতে বলতে কালিকানন্দ গুহায় ঢুকলেন। সন্ন্যাসী উঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। একখান বাঘছাল পেতে দিলেন। তিনি বসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "আশ্রম থেকে পালিয়ে এলে কেন ?"

আমি। এক যায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগল না।

কালি। কাজ কর্ম্ম কেমন চলছে ?

আমি। বুঝতে ত পারি না তবে যেমন বলে দিয়েছিলেন সেই রকমই করছি।

কালি। তা হলেই হবে।

আমি। ইনি কি আপনার শিষ্য ?

কালি। হ্যাঁ।

আমি। বিধর্ম্মীকে মন্ত্র দিতে আপত্তি নেই ?

কালি। আছে বৈকি, যাকে তাকে কি ধরে মন্ত্র দেওয়া যায় ?

আমি। তবে এঁকে দিলেন যে ?

কালি। ওঁর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি। গত জন্মে একটু পাপ করেছিলেন তাই ম্লেচ্ছবংশে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু গতজন্মে যে কাজটুকু করেছিলেন, সেটুকুত মাঠে মারা যেতে পারে না। জাতি বিচার সমাজে করতে হয়, আমাদের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে জাতি বিচার নেই। আমরা জীব মাত্রকেই শিবজ্ঞান করি। কৃতকর্ম্মের ফলাফল অনুযায়ী দণ্ড পুরস্কার হয়। ওঁর পুণ্যের ভাগটা খুব বেশী, আর গতবারেও ওনি এই পথে ছিলেন, তাই সংসারে থাকতে না পেরে নিজের ঘরদোর খুঁজে নিয়েছেন। এই তুমি যেমন, বেশ সুখে ছিলে ত, সংসারীর যা কামনা সবই তোমার ছিল, তবে বল দেখি ভাই, কিসের জন্যে তুমি বনে বনে ফলমূল খেয়ে বেড়াচ্ছ ?

আমি। তার মূলাধার ত আপনি। বেশ ছিলাম কোথা থেকে এই এক উপসর্গ জুটিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে ঢিল মারা গোছ, বা লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি না তবু মারতে হবে।

কালি। অন্ধকারে ঢিল মারা অন্যের পক্ষে হতে পারে কিন্তু তোমার নয়—তুমি জেনে শুনেও যদি ন্যাকা হও, কে কি করতে পারে ?

আমি। আমি কিছুই জানি না। যিনি গুরু তাঁকে একবার চর্ম্ম চক্ষে দেখতে পেলাম না, কেবল লুকোচুরি খেলছেন। যাঁর নাম করে ঘর সংসার, মা বাপ ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন তাঁরও দেখা পেলাম না।

কালি। দেখা দুজনেরই পেয়েছ, চিনতে পারনি।

আমি। কবে কোথায় দেখা পেয়েছি ? ছলনা করা তাঁদের স্বভাব।

কালি। ঠাকুর তোমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, মাও তোমার জন্তে শরীরি হয়ে রসগোল্লা খাওয়ালেন, তবু বলছ দেখা পেলাম না।

ও রকম দেখা আমি দেখতে চাই না। এই আপনাতে আমাতে যেমন বসে কথাবার্ত্তা কচ্চি এ রকম হলে দেখা সাব্যস্ত বটে, নইলে নয়।

কালি। সময়ে সবই হবে তখন আর আমায় মনে থাকবে না।

আমি। আপনাকে খুব মনে থাকবে, ভোলবার যো নেই কি? যে কষ্ট পাচ্ছি এ কখন জন্মে ভুলব না।

কালি। চিরকাল কিছুই থাকে না, কৃষ্ণ পেলে সব ভুলে যেতে হয়।

আমি। আচ্ছা পাইয়ে দেখুন কেমন ভুলি।

কালি। আমার যদি পাওয়াবার হত কোন দিন তোমায় দিতাম।

সে রাত্তির সেখানে কাটিয়ে তার পরদিন সকালে আবার বেরুলাম। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় একটা নদীর ধারে এসে কেমন করে পার হব ভাবছি এমন সময় একটা প্রকাণ্ড হাতী এক পা তুলে গাঁ গাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে আমার দিকে আসছে দেখে ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। একবার ভাবলাম জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পালাই কিন্তু তখুনি মনে পড়ল হাতীও ত সাঁতার দিতে পারে। ইতস্ততঃ করতে করতে হাতীটা আমার কাছে এসে একটা পা তুলে ধরলে। দেখলাম পায়ে একটা হরিণের সিং ফুটে রয়েছে। আর একটা সিং বেরিয়ে ছিল, আমি দুহাতে ধরে সজোরে টান দিলাম। সিংটা মাথা শুদ্ধ বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা রক্ত বেরুল। সিংটা বার করে দেবামাত্র হাতীটা শুয়ে পড়ল। খানিক শুয়ে থেকে উঠেই আমায় শুঁড়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নিয়ে বনের ভেতর প্রায় দুক্রোশ গিয়ে পাহাড়ের ধারে এসে শুয়ে পড়ল, আমিও নেমে পড়লাম। সুমুখে পর্ব্বত প্রমাণ

হাতীর দাঁত আর হাড়া, আমি আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে তার বুদ্ধির বিষয় ভাবতে লাগলাম। সে আমায় নামিয়ে দিয়ে একদিকে চলে গেল। গাছে নানারকম ফল দেখে লোভ সামলাতে না পেরে কতকগুলো পেড়ে খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে আবার পাহাড়ে উঠলাম। খানিকদূর যেতে না যেতে সূর্য্য পাটে বসবার যোগাড় করছেন দেখে আমিও রাত্তির কাটাবার জন্য গুহা খুঁজতে খুঁজতে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম। তিনি খুব যত্ন করে তাঁর গুহায় নিয়ে গিয়ে গোটা কতক বেদানা খেতে দিলেন। খাওয়া হলে তাঁর পাশের গুহায় রাত্তির কাটাবার জন্যে রেখে এলেন। সকালে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে স্থান ত্যাগ করে বনের ভেতর ঢুকলাম। এটা এত নিবিড় বন যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। তিন চার ক্রোশ যাওয়ার পর বন পাতলা হতে লাগল। আরো খানিক গিয়ে একটি আশ্রম দেখতে পেলাম। কিন্তু একটি ঝরণার নদী থাকায়, দাঁড়িয়ে ভাবছি কেমন করে পার হব; এমন সময় ওপার থেকে একজন সন্ন্যাসী আমায় ডেকে পূর্ব্বদিকে যেতে বল্লেন। খানিক গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে পার হয়ে আশ্রমে এলাম। আশ্রমে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মৃগচর্ম্মে বসেছিলেন। আমি যাবামাত্র আমায় বসতে বলে, তাঁর একজন শিষ্যকে কিছু খাবার আনতে বলে, আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় যাব। আমি বললাম—"যাবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছি।" যখন আশ্রমে এসেছিলাম তখন বেলা পড়ে গেছে, কাজেই সে রাত্তির সেখানে থাকতে হল।

তার পরদিন সকালে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পূর্ব্বমুখে পাহাড়ের ধারে ধারে ক্রোশ দুই গিয়েছি এমন সময় একপাল হাতী আসছে দেখতে পেলাম। সর্ব্বনাশ! পালাবার উপায় নেই, গাছে উঠলে গাছ ভেঙ্গে আছাড়

মারবে। কিং কর্ত্তব্য ভাবছি আর এদিক ওদিক দেখচি, যদি কোনরকম লুকোবার যায়গা পাই, সৌভাগ্য বশতঃ সুমুখে একটি গুহা দেখে, তাড়াতাড়ি গাছের পাশ দিয়ে, ঝোপের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে খুব সাবধানে কোন গতিকে গুহার ভিতর ঢুকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। হাতীগুলো আমায় দেখতে না পেয়ে, যেখানে আমায় প্রথমে দেখেছিল সেইখানে সবগুলো এসে জমায়েত হয়ে, বোধ হল যেন খুঁজছে। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে, যখন সন্ধান পেলে না তখন একদিকে চলে গেল। আমিও কিছুক্ষণ পরে গুহা থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলাম। বেলা পড়ে আসছে দেখে রাত্তিরের জন্যে একটি আশ্রয় খুঁজছি, এমন সময়ে একটা বাঘ ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে থাবা গেড়ে বসে লেজ আছড়াতে লাগল, আমি ত দেখেই কাঠ হয়ে গেলাম। কি করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না, ভাবলাম আজ আর রক্ষা নেই, প্রাণ নিশ্চয়ই যাবে। বাঘটা লাফায় আর কি এমন সময় কে আমায় শূন্যে তুলে কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে নাবিয়ে দিয়ে বল্লে" ঐ সোণালি পাতার গাছটা তুলে, ওর শেকড় উরুত চিরে পুরে দাও, তা হলে তোমার আর কোন হিংস্র জন্তু কি কোন রোগের ভয় থাকবে না। আমি সেখানে একটা গোল সোণালি পাতার গাছ দেখতে পেলাম, সমূলে তুলে হাতে করে ভাবছি কি দিয়ে উরুত চিরব? আবার শূন্যে থেকে বল্লেন ভাবছ কেন একটা ছুঁচল পাথর দিয়ে একটুখানি চিরে শেকড়টা চেরা মুখে ধর, আপনি মাংসভেদ করে ঢুকে যাবে। একটা খুব মুখ সরু পাথর খুঁজে নিয়ে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সামান্য একটু ছাল তুলে, শেকড়টুকু ছিঁড়ে নিয়ে, ঘামুখে যেমন ঠেকিয়েছি, অমনি সড়্ সড়্ করে প্রায়

ঢুকে গেল। খানিক পরে দেখলাম কোন চিহ্ন কি ব্যথা কিছুই নেই। কাছেই একটা গুহা পেয়ে, তাতে রাত্রি কাটালাম।

সকালে উঠে বাইরে এসে দেখলাম খুব মেঘ করেছে, বোধ হল এখুনি বৃষ্টি হবে। এক জায়গায় বসে থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ. ভাবছি এগুব কি না, এমন সময় ঝড় উঠল কাজে কাজেই গুহার ভেতর গিয়ে বসলাম। প্রায় পাঁচ ছ বছর পাহাড়ে ঘুরচি কিন্তু এ রকম ভয়ানক ঝড় কখন দেখি নি। সে যে কি ভয়ানক ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ তা বলে জানান যায় না। বড় বড় গাছের ডাল ভেঙ্গে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে তার স্থিরতা নেই। বড় বড় গাছ একেবারে উপড়ে দশ হাত তফাতে ফেলছে। পাখীগুলো স্থানভ্রষ্ট হয়ে, আর ঝড়ের প্রকোপে কোথায় যে আশ্রয় নেবে ঠিক করতে না পেরে, ঝাঁকে ঝাঁকে গুহার ভেতর ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমায় দেখে কিছুমাত্র ভয় করলে না। কোনটা মাথার ওপর বসে মলত্যাগ করে উড়ে আর এক জায়গায় বসল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামল। ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে, এক পাল কস্তুরি মৃগ গুহার ভেতর ঢুকল, কস্তুরি সৌগন্ধে গুহা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার পর সে প্রলয়ের একটু বিরাম হল, কিন্তু বৃষ্টি ধরল না। আমিও বাইরে যেতে পারলাম না, গুহার ভেতর পড়ে রইলাম। খিদে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভাবলাম না হয় ভিজতে ভিজতে গিয়ে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এমন সময় একজন সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে ঢুকে হরিণ গুলোকে তাড়িয়ে স্থান করে বসলেন। আমি এক কোণে থাকায় আমায় দেখতে পান নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "বাবা এই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় বেরিয়েছেন ?" তিনি আমার কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে আমি যে কোণে

বসেছিলাম সেই দিকে তাকিয়ে বল্লেন "কে বাবা তুমি—আমি ত তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।" আমি বললাম "আমি একজন ভবঘুরে বাবা। জল ঝড়ের জন্তে এখানে আশ্রয় নিয়েছি।"

সন্ন্যাসী। এই নিবিড় বনে ভবঘুরে কখনই থাকতে পারে না, আপনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। আমি তাঁর কথা শুনে খুব হাসলাম, তার পর হাসতে হাসতে বললাম "বাবা, আপনি ভুল বুঝছেন, সত্যিই আমি ভবঘুরে। মহামায়ার চক্রে পড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

সন্ন্যাসী। একবার অন্ধকার থেকে আলোয় আসুন, আপনাকে দর্শন করি।

আমি কোণ ছেড়ে যেমন উঠেছি অমনি পাখীগুলো ঝটাপট করে উড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পালাল। তখন বৃষ্টি ধরে গেছে, সুয্যি মামাও দেখা দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে না বসে একেবারে বাইরে এসে বসলাম। তিনি আমায় দেখে বললেন "বাবা তোমায় সামান্ত ভবঘুরে বলে বোধ হচ্ছে না, তুমি কতদিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করেছ?"

আমি। বোধ হয় পাঁচ ছ বছর হবে।

সন্ন্যাসী। এত দিন কি এই বনে বনে বেড়াচ্ছ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। কোথাও কোন আশ্রমে থাক নি কেন?

আমি। ভাল লাগে না, মহামায়ীর বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়। তা ছাড়া যে জন্তে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি, আশ্রমে থাকলে ত কিছুই দেখতে পাব না, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি বসুন, আমার বড় খিদে পেয়েছে কিছু ফল খুঁজে আনি।

সন্ন্যাসী। (হেসে) পোড়া পেটটা যদি না থাকত তা হলে কোন

বালাই ছিল না। যাক্ কোথাও যেতে হবে না, আমি খাবার দিচ্ছি। বলে কমণ্ডলু থেকে গোটা খতক পেঁড়া দিলেন।

আমি। বাবা! এই বনের মধ্যে পেঁড়া কোথায় পেলেন?

সন্ন্যাসী। এই পাহাড়ের নীচে বস্তী আছে, কাল সেখানে গেছলাম একটি ভক্ত দিয়েছে।

আমি। এখান থেকে সে গ্রাম কতদুর?

সন্ন্যাসী। বোধ হয় বিশ পঁচিশ ক্রোশ হবে।

আমি। এই বিশ পঁচিশ ক্রোশ কতক্ষণে এসেছেন?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছামাত্র।

আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আমার ভাব দেখে হেসে বললেন "বাবা, তুমি আশ্চর্য্য হচ্চ কেন, তোমার কি গুরুকরণ হয় নি? যোগের দ্বারা সহস্র যোজন পথ চক্ষের নিমিষে যাওয়া যায়, জান না কি?

আমি। গুরুকরণ হয়েছে আবার নাও হয়েছে। আমি স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছি আর স্বপ্নেই গুরুকে দেখেছি, চাক্ষুষ দেখি নি।

সন্ন্যাসী। ওঃ বুঝেছি, এখনও তোমার কর্ম্মের শেষ হয় নি, তাই ঠাকুর তোমায় দেখা দেন নি। ক্রিয়া পেয়েছ ত? তোমার চেহারায় বোধ হচ্ছে তুমি অনেক এগিয়েছ। জল খাবে? আমি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে পেটের জ্বালায় পেড়াগুলো শেষ করে ফেলেছিলাম। তিনি কমণ্ডলুটা এগিয়ে দিলেন, আমি জল খেলাম, এমন সুস্বাদু জল কোথাও কখন খাই নি।

সন্ন্যাসী। এখন কোথায় যাবে?

আমি। যেদিকে হয় যাব, আপনাকে আঁর বিরক্ত করব না।

সন্ন্যাসী। তুমি এখানে থাকলে বরং সন্তুষ্ট হব, বিরক্ত হব কেন? আর এই অবেলায় কোথাও গিয়ে কাজ নেই, আজ এইখানে থাক। কাল না হয় যেখানে ইচ্ছে যেও।

আমি তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে বসে গল্প করতে লাগলাম। তিনি বললেন "এখান থেকে পূর্ব্বদিকে দশ বার দিন গেলে একটি জায়-গায় একটি শিব আছেন, একপক্ষে ক্ষয় হন, আবার শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি হন, দেখবার জিনিষ বটে। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও সমাগম হয় কিন্তু বড়ই কঠিন পথ। পাহাড় বেয়ে ওঠতে একবার পা পেছলালেই আর বাঁচতে হবে না।" আমার বড় কৌতূহল হল, মরি বাঁচি যেতেই হবে। অনেক তীর্থের কথা বললেন আমিও শুনতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তিনি উঠে বললেন "বাবা এখন আমি চললাম, যদি কিছু খাবার ইচ্ছে হয় কমণ্ডলুতে পাবে। যদি থাক কাল দেখা হবে।" তিনি চলে গেলেন। আমি সেইখানে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, সকালে কি ভয়ানক কাণ্ডই না হয়ে গেল, এখন সমস্ত স্থির, সন্ধ্যায় কি সুন্দর শোভা! কত রকম ভাবনা চিন্তা মনে আসছে আর যাচ্ছে। যাকে অনেক দিন দেখি নি, দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। ভাবলাম হয়ত তিনি বেঁচে নেই, তাঁর যে রকম শরীর দেখেছিলাম হয়ত মারা গেছেন। যদি মারা গিয়ে থাকেন তা হলে মনে বড়ই দুঃখ থেকে যাবে। যদি যোগসিদ্ধ হতাম, একবার গিয়ে দেখে আসতাম কিন্তু সে আশা নেই, আর কখন যে হবে সে ভরসাও ত নেই। এতদিন মিছে ঘুরে বেড়ালুম, কিছুই হোল না। সন্ধ্যে হয়ে এল, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হল, আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলি ঝিকঝিক করে জ্বলছে। চারি দিক নিস্তব্ধ নিথর কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ আওয়াজ আর মধ্যে মধ্যে বুনো

জন্তুর ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বসে থাকতে আর ভাল লাগল না, গুহার ভেতর গিয়ে কমণ্ডলুটায় হাত দিয়ে একটা ফল পেলাম সেইটে খেয়ে একটু ইষ্টচিন্তা করে শুলাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম মা আমায় কোলে করে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন আমায় দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল তাই এসেছি, আমি বেঁচে আছি, এখন মরব না। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখলাম বেলা হয়ে গেছে। উঠে বসে স্বপ্নের কথা মনে করে মন প্রফুল্ল হল। পূর্ব্বমুখে পাহাড়ের ওপর দিয়ে যেতে যেতে পূর্ব্বদিনের প্রকৃতির অত্যাচারের চিহ্ন দেখতে দেখতে অগ্রসর হলাম। ঝড়ে বড় বড় গাছ উপড়ে ধরাশায়ী করেছে; কোনটার ডালগুলি ছিঁড়ে, ভেঙ্গে কেবলমাত্র গুঁড়ি সার করেছে। নদীর ধারের গাছগুলি সারি সারি নদীগর্ভে শুয়ে পড়েছে। কেবল পাহাড়ের আড়ালে যে সব গাছ ছিল সেগুলি বেঁচে গেছে বটে কিন্তু দু একটা ডাল না নিয়ে ছাড়ে নি। পশু পক্ষীও অনেক মরেছে। সমস্ত দিন চলে সন্ধ্যের সময় নদীর ধারে বসে একটু জিরিয়ে গুহার সন্ধানে পাহাড়ে উঠে একটি গুহা পেয়ে, তার মধ্যে আশ্রয় নিলাম।

দিন দুই আর পাহাড়ে উঠি নি, নদীর ধারে ধারে চলেছি। তিন দিনের পর পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবছি উঠব কি না, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী, আমারই মতন দিগম্বর কাছে এসে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় যাবো। আমি সেই শিব দর্শন করতে যাব বল্লাম। তিনি বল্লেন "পথ বড় দুর্গম, আর পথে এত বরফ যে যাওয়া বড় কঠিন। পথে একটিও গাছ পালা নেই, ফল মূল কিছুই পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আর একটি সুগম পথ আছে, একটু ঘুর হয় আর যেতেও বিলম্ব হবে। আরও একটু পূর্ব্বমুখে গিয়ে একটি নদী দেখতে

পাবে, নদীর ধারে ধারে গেলে তত কষ্ট হবে না, আর প্রচুর পরিমাণে ফল পাবে। সেই নদীর ধারে শিবলিঙ্গ আছেন। আমাকে একটি শেকড় দিয়ে সন্ধ্যের সময় খেতে বল্লেন। যে পথে আমি যাব সে পথে দু চার দিন ফল টল পাব, তার পর সেখান থেকে বরফে পড়লে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। শেকড়টা খেলে খিদে তৃষ্ণা কিছুই থাকবে না, আর শীতও পাবে না। আমি শেকড়টা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "যদি এখন খাই তা হলে কি কিছু অনিষ্ট হবে?"

সন্ন্যাসী। অনিষ্ট কিছুই হবে না, তবে বড় গরম বোধ হবে। এখান থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে, যেখানে পৌঁছিবে, সেখানে এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডা, আরো যত ওপরে যাবে তত বেশী ঠাণ্ডা পাবে।

তাঁর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় নদীর ধারে এলাম। এখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বেশী। ইতস্তত না করে শেকড় খেয়ে নদীর জল পেট ভরে খেলাম। জল এমন ঠাণ্ডা আর মিষ্টি যে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নদীর ধারে ধারে ক্রোশ খানেক গিয়ে সন্ধ্যা হল। কাছেই একটা গুহা পেয়ে ভেতরে ঢুকে বোধ হল, কেউ এখানে থাকে, কেন না একখানা কম্বল, একটি কমণ্ডলু আর একখানি মৃগচর্ম্ম ছিল। যেই বাস করুক না কেন, আমার কি, আমিত আর নড়ছি না। গুহার বাইরে পাথরের ওপর বসে সন্ধ্যা আহ্নিকে মন দিলাম। আমার জপ প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময়ে একটি ভৈরবী এক ত্রিশূল হাতে করে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স বোধ হয় তিরিশের মধ্যে, একে স্ত্রীলোক তায় ভৈরবী বয়েস আঁচা বড় শক্ত। খুব সুন্দরী, তাঁর মতন সুন্দরী সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। চোখ দুটি বড় বেশ টানা, ভ্রূযুগল

জোড়া ঠিক যেন ধনুকটি, মুখখানি হাসি মাখান। আমায় জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কোথায় যাবে?"

আমি। পূর্ণিমেশ্বর শিব দর্শন করতে যাব ইচ্ছে করে এদিকে এসেছি।

ভৈরবী। এটা একটু সুগম পথ বটে, কিন্তু বড় ঘুর হয়। ঐ পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেলে পথ খুব সোজা কিন্তু ভয়ানক।

আমি। ঘুর আর সোজা,—আমার পক্ষে দুইই সমান। আরাম নিয়ে বিষয়, বোধ হয় পূর্ণিমা নাগাদ গিয়ে পৌঁছুতে পারব।

ভৈরবী। বোধ হয় না—আজ পঞ্চমী, দশ দিনে এ পথে সেখানে যেতে পারবে না। শীতে বড় কষ্ট পাবে।

আমি। শীত আমায় লাগবে না।

ভৈরবী। (নয়ন বিস্ফারিত করিয়া) রক্ত মাংসের শরীরে শীত লাগবে না—কি রকম? এখানেই রাত্তিরে শীত করে, আর পথে বরফ পড়ে, টের পাবে তখন।

আমি। কোন কথা না ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি এখন শীত করছে?

ভৈরবী। তত বেশী এখন করছে না, তবে গা শিড় শিড় করছে ঠাণ্ডা লাগছে :

আমি। কৈ, আমার ত কিছুই বোধ হচ্চে না, বরং একটু গরম বোধ হচ্চে।

ভৈরবী। (সহাস্যে) আপনি মহাপুরুষ।

আমি। মহাপুরুষ টুরুষ নই গো বাছা, সামান্য মানুষ।

বোধ হয় তিনি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌লেন না। গুহার ভেতর

ঢুকে পাথর ঠুকে আগুন করে ধুনী জ্বাললেন। আমি বাইরে বসে রইলাম, মেয়ে মানুষের সুমুখে উলঙ্গ যেতে বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। তিনি বিবস্ত্রা নন, একটু ছাল কোমরে বাঁধা ছিল, কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করা। ছালখানা মাথার দুদিক দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের ওপর ফেলা ছিল। তাতে বুক যে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল তা নয়, তবে একেবারে খোলার চেয়ে কিছু ঢাকা ছিল। চুল লম্বা আর কালো মিশমিশে। তিনি ভেতরে যাওয়ার পর আমার গায়ত্রীর যে টুকু বাকী ছিল সেরে নিলাম। যখন ধুনী বেশ ধরেছে তখন তিনি আমায় ডেকে বললেন "ভেতরে এস, আর বাইরে বসে থেক না ঠাণ্ডা পড়ছে।" আমি ভেতরে গিয়ে এক পাশে বসলাম।

ভৈরবী। ওখানে কেন বসলে ? এই মৃগচর্ম্মখানার ওপর বস।

আমি। বেশ আছি থাক। আমার স্ত্রীলোকের ওপর বিশ্বাস খুব কম, তিনি যেই হোন না। সেই জন্যে আমি কাছে গিয়ে বসতে চাই নি। তিনি বার বার বলায় কি করি উপরোধ এড়াতে না পেরে গিয়ে বসলাম। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খাবে কি ?

আমি। আমার বিন্দুমাত্রও ক্ষিদে নেই, কিছুই খাব না।

ভৈরবী। আমায় যদি অনুমতি করেন, তাহলে কিছু খাই।

আমি। সচ্ছন্দে। খাবার জন্যে অনুমতির আবশ্যক হয় না।

গুহার এক কোণ থেকে গোটা দুই ফল আর এক ভাঁড় জল বার করে তিনি আহারে বসলেন। খেতে খেতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন " একটু সঞ্জিবনী খাবেন ?"

আমি। আমার কিছুই আবশ্যক নেই।

ভৈরবী। এ সঞ্জিবনী আমি নিজে তৈরী করেছি, খেয়ে দেখ না খুব সুস্বাদু।

অনেক দিন নেশা পত্র কিছুই হয় নি, একটু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, আর তাঁর আকিঞ্চনে না বলতে পারলাম না। তিনি সেই ভাঁড় থেকে নরকপালে খানিকটা ঢেলে দিলেন, আমিও সেটুকু বদনে দিলাম। তিনি উপর্য্যুপরি তিন চার পাত্র পান কল্লেন। আমাকে আর এক পাত্র খাবার জন্যে অনুরোধ করলেন, কি করি, যখন এক পাত্র খেয়েছি তখন আর খাব না বলতে পারলাম না, আর এক পাত্র খেলাম। খাওয়া দাওয়ার পর তিনি আমার গা ঘেঁসে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোন্ মঠাভিষিক্ত ?

আমি। তা জানি না।

ভৈরবী। জান না—তুমি কি সাধনা কর না ?

আমি। সাধনা টাধনা করি না, কেবল বনে বনে ঘুরে বেড়াই।

তিনি আমার কথা বিশ্বাস না করে বল্লেন "এ কথা সম্ভবই নয়, যে রকম চেহারা, তাতে আমার ধারণা তুমি তান্ত্রিক, আমিও তাই।"

আমি। সত্য বলছি আমি কোন মতেই সাধনা করি না।

ভৈরবী। তুমি যাই বল না কেন, আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে না। যাক, সে জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না। যার যা সে তাই নিয়েই থাক। আর এক পাত্র খাবে ?

আমি। না—আর খাব না, আমার বেশ আনন্দ হয়েছে।

ভৈরবী। সামান্য দুপাত্রে তোমার আনন্দ হোল ? আমি চার পাত্র নিয়েছি তবু আনন্দ জমেনি। তিনি আবার দুপাত্র পান করলেন, আর এক পাত্র আমার হাতে দিলেন।

আমি। আমার আর দরকার নেই, তুমি খাও।

তিনি মুচকি হেসে, চোখ ঘুরিয়ে, কটাক্ষ হেনে, "না খেয়ে ফেল, সুবোধ বালকের মত" বলে পাত্রশুদ্ধ আমার হাত ধরে মুখে তুলে দিলেন, কি করি খেলাম। তাঁর ধরণ-ধারণ, হাব-ভাব দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছিল না। মনে মনে ভাবলাম, আজ জগদম্বা না জানি কি বিপদে ফেলবেন। ভৈরবী ইতিমধ্যে ধুনিতে আরো দুখানি কাঠ ফেলে দিয়ে আলো করলেন।

আমি। তোমার এ গুহার পাশে কি আর গুহা আছে?

ভৈরবী। কেন?

আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখি যে দুগোছা চুল বুকের উপরে স্তন ঢাকা ছিল, সরিয়ে পিঠে ফেলে দিয়েছে। মরুক—তাতে আর আমার কি। আমি বল্লাম "বড় ঘুম পাচ্ছে, সেখানে গিয়ে শুতাম।"

ভৈরবী সেই রকম দুষ্টু, মাথা ঘোরাণ হাসি হেসে চোখে আবাল্য এনে বল্লে, এখানে শুতে আপত্তি আছে কি?

আমি। আমি পুরুষ মানুষ—আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি স্ত্রীলোক, একসঙ্গে এক গুহায় থাকা কি উচিত?

ভৈরবী। অনুচিত কেন? আমি ত আর সংসারে নেই যে কলঙ্কের ভয় করব? তুমি থাক আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

আমি। তবে এইখানে শুয়ে পড়ি।

ভৈরবী। এত তাড়াতাড়ি কেন? আচ্ছা—তুমি কত দিন বেরিয়েছ? বে থা করেছিলে, তোমার বৌ আছে?

আমি। অনেক দিন বেরিয়েছি। বে হয় নি।

ভৈরবী। বে হয়নি—এমন সুন্দর যুবাপুরুষ, বে হয়নি? বিশ্বাস হয় না।

আমি। আমার কোন কথাই ত তোমার বিশ্বাস হচ্চে না, অথচ আমি একটিও মিথ্যে বলি নি।

ভৈরবী। যাক—একখানি বৈ ত কম্বল নেই, এস দুজনে গায়ে দিই।

আমি। আমার শীত করে নি, তুমি গায়ে দাও।

ভৈরবী। আচ্ছা, এদিকে সরে এসে শোও।

আমি। এখানে ত বেশ আছি।

ভৈরবী। না—না—গুহার দোরের ঠিক সুমুখে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। এধারে এস। চামড়াটা একটু ছাড়।

আমি সরে গেলাম, তিনি চামড়াখানা সরিয়ে কোণে পাতলেন। আমার হাত ধরে কোণের দিকে এনে বল্লেন "এইখানে শোও।" যেমন বলা অমনি শোয়া। তিনি আমার পাশে শুলেন। একটু উস্‌খুস্ করে কম্বলখানা আমার গায়ে চাপা দিয়ে, গায়ে পা তুলে দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আমি প্রমাদ গুন্‌লাম। মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করতে লাগলাম। মড়ার মত পড়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দিলাম। সে খানিকক্ষণ আশপাশ করে, নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও তখন দুর্গা দুর্গা বলে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। খুব ভোরে, সে উঠবার আগেই, উঠে পড়লাম। কিন্তু গুহার ভিতর আর তাকে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম বাইরে গেছেন। কালবিলম্ব না করে পথে আকার।

ত্রয়োদশ অঙ্ক

তখন বেশ সকাল হয় নি, একটু ঘোর ঘোর ছিল। আমি নদীর ধারে ধারে বরাবর চল্‌তে লাগলাম। পথে মধ্যে মধ্যে যায়গায় যায়গায় বরফ পড়ছে। গাছ থেকে বৃষ্টির জলের মতন হিম পড়ছে কিন্তু আমার কিছুই শীত বোধ হচ্ছিল না। খানিক পরে সুর্য্যি মামা একখানি সোনার থালার মত আকাশে ধীরে ধীরে ঠেলে উঠছেন। পাখীগুলো কেচর মেচর করে উঠ্‌ল। প্রায় ক্রোশ দুই গিয়ে দূর থেকে দেখ্‌তে পেলাম এক যায়গায় আগুন জ্বলছে। আমি ভাবলাম হয়ত সন্ন্যাসীদের আশ্রমে আগুন জ্বলছে, তা যদি হয়, একটু বিশ্রাম করে তবে আবার এগুব। যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি, সে কতদূর বা কতদিনে সেখানে পৌঁছব তা জানি না, তবে যতদিনই লাগুক বা যত দূরই হোক যেতেই হবে। যেখানে আগুন জ্বলছিল সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম একজন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। আমায় দেখেই বল্লেন "আরে জগবন্ধু যে, এ দিকে কোথায় চলেছ?"

আমি তাঁকে সেখানে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম "আপনি এখানে?"

তিনি হেসে বল্লেন "আশ্চয্য হয়ে গেলে যে?"

আমি। আশ্চর্য্য হবার কাজ করলেই আশ্চর্য্য হতে হয়। আমি কখন ভাবিনি যে আপনাকে এখানে দেখ্‌তে পাব।

সন্ন্যাসী। আমি কিন্তু ঠিক জানতাম তুমি এদিকে আসবে। কেমন আছ বল?

আমি। ভালই আছি।

সন্ন্যাসী। তোমার শীত করছে না?

আমি। কৈ—আমার ত শীত আদতে বোধ হচ্চে না।

সন্ন্যাসী! মহাপুরুষদের শীত লাগে না।

আমি। আর ঠাট্টা কেন? পথে একটি সাধু একটা শেকড় খেতে দিয়েছিলেন, তার গুণে ক্ষীদে তেষ্টা কি শীত কিছুই থাকবে না।

সন্ন্যাসী। বটে? তোমার অদেষ্ট ভাল, তাই এই সব অমূল্য জিনিষ পাও।

আমি। অদেষ্ট ভাল না হলে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। আপনার কুহকে পড়ে নাজেহাল পরেসান হচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তাত হচ্চ দেখতেই পাচ্চি। এখন কোথা যাওয়া হবে?

আমি। এইদিকে কোথায় পূর্ণিমেশ্বর আছেন, দর্শন করতে যাব।

সন্ন্যাসী। সে যে বড় দুর্গম যায়গা, সেখানে যেতে পারবে?

আমি। না যেতে পারবার ত কোন কারণ দেখতে পাই না। এখান থেকে কতদূর?

সন্ন্যাসী। আর সাত আট দিন গেলে, তবে সেখানে পৌঁছুতে পারবে।

আমি। আপনি কি এখন এখানে থাকবেন?

সন্ন্যাসী। এখন দিনকতক থাকতে হবে।

আমি। আর কতদিন এমন করে ঘোরাবেন?

সন্ন্যাসী। আমি ঘোরাচ্চি বুঝি? যাক, দিন সংক্ষেপ হয়ে এসেছে। পূর্ণিমেশ্বর দর্শন করে এস।

আমি। দর্শন করে ফেরবার সময় আপনাকে কি এখানে পাব? তত দিন কি আপনি থাকবেন?

সন্ন্যাসী। ঠিক বলতে পারলাম না, থাকলেও থাকতে পারি। কাল রাত্তিরে কেমন ছিলে?

আমি। বেশ ছিলাম, মেয়ে মানুষের ভুজপাশে আবদ্ধ হয়ে রাত কাটিয়েছি।

সন্ন্যাসী। তোমার ভাই বাহাদুরী আছে। অমন সুন্দরী মেয়ে মানুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে যখন তোমার কামের উদ্রেক হয়নি, তখন তুমি জিতেন্দ্রিয় ত নিশ্চয়ই, তা ছাড়া তুমি একজন মহাপুরুষ।

আমি। এ সব তোমাদেরই খেলা বলে মনে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। এ আমাদের খেলা নয় হে, মহামায়ার নিজের খেলা, এটা বুঝতে পারনি ভায়া। এই তুমি বুদ্ধিমান, এত লেখাপড়া শিখেছ, এটুকু বুদ্ধিতে যোগাল না। তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে ফাঁদ পেতে-ছিলেন, কিন্তু ফাঁদে না পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। জিতেন্দ্রিয় না হলে পূর্ণিমেশ্বর শিবের দর্শন পাওয়া যায় না। এবারেও বেটী তোমায় ঠকিয়েছে।

আমি। এ রকম ঠকানর লাভ কি? আচ্ছা, আমি যদি কামের বশ হতাম কি হত?

সন্ন্যাসী। তোমার মনের জোর বোঝা আর স্ত্রীলোকের মোহে পড় কিনা পরীক্ষা করা। যদি তুমি কামের বশীভূত হয়ে, কামাঙ্গ-চরিতার্থ কত্তে যেতে তা হলে তোমার পতন ও পিঁপড়ের মতন মৃত্যু নিশ্চিত। সে তেজ ধারণ করবার তোমার আমার ক্ষমতা নেই। শিব যাঁর কাছে পরাজিত আমরা ত কোন ছার, কীটাণুকীট।

আমি। পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হলাম তখন স্বমূর্ত্তি দেখালেই ত পারতেন।

সন্ন্যাসী। তা কি সহজে দেখায় ভাই? চাপ না দিলে খাপ খোলে না।

আমি। চাপ দেওয়াটা আপনারা ত সহজে শেখাবেন না।

সন্ন্যাসী। যিনি শেখাবার মালিক তিনিই সময়ে শিখিয়ে দেবেন।

আমি। এ জন্মে কি আর সময় হবে না?

সন্ন্যাসী। কাছিয়ে এসেছে আর বড় বিলম্ব নেই।

আমি। তবে এখন আসি, মিছে আর এখানে বসে সময় নষ্ট করি কেন?

সন্ন্যাসী। আচ্ছা ভাই এস—কিছু খাবে না?

আমি। কি ক্ষীরসরনবনী খাওয়াবেন যে কেবলই বলছেন কিছু খাবে না? বললাম খাবার ইচ্ছে নেই, খিদে নেই।

সন্ন্যাসী। ক্ষীরসর পেলে খাও নাকি? এস বলিয়া সত্যই ক্ষীর আর সর কমণ্ডলু হইতে বাহির করিলেন।

আমি। 'আপনাদের শ্রীচরণে শত শত কোটি প্রণাম' বলে হাসতে হাসতে সে স্থান ত্যাগ করলাম। এঁকে বোধ হয় চিনতে পেরেছেন, ইনি সেই মহাপুরুষ কালিকানন্দ।

চতুর্দ্দশ অঙ্ক

পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। আট দিনের দিন সেখানে উপস্থিত হলাম। মন্দির টন্দির নেই, খোলা মাঠে নদীর ধারে একটি হাতখানেক বেদির ওপর, আধ হাত উঁচু, শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ, চারিদিক বরফে ঘেরা! অনেক সাধু সন্ন্যাসী সেখানে কুটীর বেঁধে আছেন। আমি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছে যাবা মাত্র আদর যত্ন করে বসালেন। আমি প্রায় সন্ধ্যে হব হব সময় পৌঁছেছিলাম। সন্ন্যাসীরা কুটীরের সম্মুখে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। কেওবা ধ্যানস্থ, কেওবা শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করছেন। কোথাও বা তিন চার জন বসে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। আমি যাঁর কাছে বসেছিলাম, তিনি বললেন "ঠাকুরের পূর্ণমূর্ত্তি হতে এখনও বিলম্ব আছে। আজ প্রতিপদ, আজ থেকে বৃদ্ধি হয়ে পূর্ণিমার রাত্তির দুপুরের সময় পূর্ণ হবেন।"

আমি। রোজ একটু করে বাড়েন, না পূর্ণিমার রাত্রে একেবারে পূর্ণ হন?

সন্ন্যাসী। নিত্য বাড়েন, আজ দেখছেন ত সামান্য তুষার ছেয়েছে, কাল দেখবেন চার পাঁচ আঙ্গুল উঁচু তুষারে ঢেকেছে। এই রকম পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হবেন।

আমি। কত উঁচু হবেন?

সন্ন্যাসী। তার প্রমাণ। আজ যদি পাঁচ আঙ্গুল বাড়েন, কাল দশ আঙ্গুল বাড়বেন। এই রকম রোজ দ্বিগুণ ভাবে বাড়তে থাকবেন।

আমি। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে ক্ষয় আরম্ভ হয় বুঝি?

সন্ন্যাসী। যেমন বৃদ্ধি তেমনি ক্ষয়। এক পক্ষে বৃদ্ধি আর এক পক্ষে ক্ষয়। জগতের দশা দেখাচ্ছেন। এক দিকে ভাঙ্গন অন্য দিকে পূর্ণতা।

আমি। এ শিব দর্শনের ফল কি ?

সন্ন্যাসী। শিব দর্শনের ফল শিব দর্শন। আমরা নিষ্কাম সাধনা করি। তবে এঁকে দর্শন আর পূজা করলে মনস্কামনা শীঘ্র পূর্ণ হয়। আপনার দেখছি শীত নেই।

আমি। কৈ আমার ত কিছু শীত বোধ হচ্ছে না। আপনাদের কি শীত পাচ্চে ?

সন্ন্যাসী। আপনি কি বলছেন ? এত শীতে শীত পাচ্চে না ? গণ্ডারের চামড়া ত আর আমার গায়ে নেই বাবা!

আমি। আমার কিন্তু মোটেই শীত বোধ হচ্চে না।

সন্ন্যাসী। আপনি একটু বস্থন, আমি সন্ধ্যেটা সেরে আসি।

তিনি কুটীরে ঢুকে ঘৃত প্রদীপ হাতে করে বরাবর শিবের কাছে গিয়ে বসে, পাথর ঠুকে আগুন করে প্রদীপটা জ্বেলে সুমুখে রেখে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। আমিও সেখানে গিয়ে সন্ধ্যে করতে বসলাম।

নিত্য সকালে উঠে ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করে শিব পূজা করি। শিব নিত্যই বরফে ঢাকা পড়ে বাড়ছেন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। দশমীর পর আর মাথায় বিল্বপত্র চাপাবার যো থাকে না, কারণ একাদশীর দিন মানুষের চেয়ে প্রায় দু হাত উঁচু হন। ফুল টুল ছুঁড়ে পূজা করতে হয়। পূর্ণিমার দিন খুব বেড়ে উঠেছেন, আমার বোধ হল তাল গাছের চেয়েও উঁচু। নিকটে যে সব পাহাড় আছে, তাদের ছাড়িয়ে উঠেছেন। আমি সমস্ত দিন চারিদিকে ঘুরে বেড়াতাম, আর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতাম। সন্ন্যাসীরা সকালে সকলে কুটীর ছেড়ে তপস্যা করতে যেতেন।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় ঘুরে ফিরে যেই সন্ন্যাসীদের কাছে বসলাম, তিনি বললেন "আজ রাত্তির দুপুরের সময় শিবশক্তি সম্মিলিত হবেন, সে সময় পূজ করায় খুব ফল, আমরা সকলে পূজ করে থাকি, আপনারও করা উচিত।"

সন্ন্যাসী। ফুল বিল্বপত্রের আবশ্যক কি? মানস পূজাই হচ্ছে প্রশস্ত। যে সময় শিবশক্তির বাহ্যিক সম্মিলন হবে, সেই সময় কুণ্ড-লিনীকে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে শিবশক্তি সংযোগ করে পূজা করলেই হল।

আমি তাঁর কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারলাম না, হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম। তিনি ভগবদ্‌চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন ছিলেন যে আমার ভাব আদপে লক্ষ্য করেন নি।

রাত্তির দুপুরের সময় সমস্ত সন্ন্যাসী শিবের চারিধারে বসে ধ্যানস্থ হলেন। আমিও তাঁদের দেখা দেখি এক ধারে বসলাম। এক একবার চোখ বুজি আবার তখুনি চেয়ে এদিক ওদিক দেখি। খানিক পরে একটি মধুর শব্দ কাণে বাজতে লাগল। যত সময় অতিবাহিত হতে লাগ্‌ল, সেই মধুর শব্দ ততই কাছে আসতে লাগল। দূর থেকে অল্প শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে বেশ স্পষ্ট রুণুঝুণু, ঝুণ্‌ঝুণ্‌ নূপুরের শব্দের মতন শুনতে পাওয়া গেল। ওপরে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি। একটু পরে সে মধুর মন মাতান শব্দ শুনতে পাওয়া গেল না। চারিদিক নিস্তব্ধ নীরব, কেবল মধ্যে মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ কর্কশ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। যে সময় সেই মধুর শব্দটি থেমে গেছ্‌ল, আর চারিদিক সৌগন্ধে আমোদিত হয়েছিল, তখন ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দও বন্ধ ছিল। আমি চোখ বুজে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করেছিলাম। বোধ হয় দশ পনের মিনিট পরে আবার সেই রকম শ্রুতি-সুখকর দেব-বাদ্য শুনতে পেলাম।

ক্রমে নিকট থেকে দূরে, আরো দূরে চলে যেতে লাগল, শেষে সেই মধুর শব্দের রেষমাত্র শুনতে পেলাম। আর কিছুক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার কর্কশ শব্দ রয়ে গেল। সন্ন্যাসীরাও হর হর ব্যোম, শিব শঙ্কর, আশুতোষ বলতে বলতে যে যাঁর কুটীরে গিয়ে শয়ন করলেন। আমিও আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে শুলাম। তার পরদিন ঘুম ভাঙ্গতে বেলা হয়ে গেছ্‌ল, উঠে দেখলাম সকলেই তপস্যায় গেছেন। আমি হাত মুখ ধুয়ে, কিছু ফুল বেলপাতা এনে শিবের কাছে গিয়ে দেখলাম, প্রায় তিন হাত ক্ষয় হয়েছেন। পূজা করে কুটীরের বাইরে এসে ভাবলাম আর এখানে থাকবার দরকার কি? বেরিয়ে পড়ে আবার বনে বনে টো টো করে ঘুরিগে। যেমন মনে হওয়া অমনি প্রস্থান।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে চলতে লাগলাম, যত ওপরে যাই ততই নদীর জল বরফে ঢাকা। পাঁচ ছ ক্রোশ ওপরে গিয়ে আর জল দেখতে পেলাম না, যেন সাদা মার্ব্বেল সোজা পাতা রয়েছে। সন্ধ্যের সময় গুহা খুঁজতে খুঁজতে একটি অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম। তাঁর বয়েস যে কত তা অনুমান করা যায় না। দিব্যি তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, বলিষ্ঠ দেহ, দাড়ি গোঁপ, মাথার চুল সাদা ধপ্‌ধপে। গায়ের চামড়া যদিও লোল হয়েছে, আর বয়েসও অত হয়েছে তবু কোমর ভেঙ্গে কুঁজ হন নি। গায়ে একখানি বাঘের ছাল দিয়ে, একখানি মৃগচর্ম্মে ধুনীর সুমুখে বসে আছেন। আমায় দেখে হেসে বললেন "এস বাবা, বস।" আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম।

সন্ন্যাসী। শিবশক্তি সংযোগ দেখে এলে?

আমি। শিবশক্তি সংযোগ ত দেখতে পাই নি, তবে নূপুরের শব্দ শুনেছিলাম।

সন্ন্যাসী। জ্ঞানচক্ষু না খুললে সংযোগ দেখতে পাওয়া যায় না।

আমি। বাবা! আপনি দয়া করে খুলে দিন না। তাঁকে দেখে আমার খুব ভক্তি হয়েছিল। আশাও করেছিলাম হয়ত তিনি দয়া করে উপদেশ দেবেন। কিন্তু অদৃষ্ট—দিলেন না, বললেন "আমি ত তোমার গুরু নই বাবা। যিনি তোমার জন্ম জন্মান্তরের গুরু, তিনিই তোমায় জ্ঞান দেবেন। তাঁর দেখা পেয়েছ ত?"

আমি। আজ্ঞে না, আমার পোড়া কপাল, এ পর্য্যন্ত তাঁর দর্শন পাই নি। গুরু কি জন্মে জন্মে একজনই হন? তাঁকেও কি শিষ্যদের জন্যে বারবার জন্ম নিতে হয়?

সন্ন্যাসী। তা হয় বৈ কি? তবে তোমার গুরুর স্বতন্ত্র কথা; তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ? তোমার গুরুকে স্বপ্নে দেখেছ আর তোমায় মন্ত্রও দিয়েছেন। পথে আসতে শীত আর ক্ষুধা নিবারণী শেকড় দিয়েছিলেন, নইলে তোমার সাধ্য কি তুমি এ পথে এস। তোমার ওপর তাঁর অসীম দয়া, শুধু তাঁর কেন, মহামায়ীরও তোমার উপর যথেষ্ট দয়া আছে। তিনিও ত ৩ তিনবার তোমায় দেখা দিয়েছেন।

আমি। আমি ত তাঁদের চিন্তে পারি নি।

সন্ন্যাসী। সময় হলেই চিন্তে পারবে।

আমি হতাশ হয়ে বললাম "আর কত দিনে সময় হবে জানি না। এত দিন বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু তাঁদের দয়া হ'ল না। আর কত দিন ঘোরাবেন তাঁরাই বলতে পারেন।"

সন্ন্যাসী। আর বড় বেশী বিলম্ব নেই, সময় হয়ে এসেছে। যা কিছু বিঘ্ন বাধা ছিল শিব দর্শনে সমস্ত কেটে গেছে। তুমি বড় ভাগ্যবান।

আমি। ভগবান যেন আমার মত ভাগ্যবান আর কাওকেও না করেন। বেশ সুখে ছিলাম, কি কুক্ষণেই সেই হতভাগা সন্ন্যাসীটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সন্ন্যাসী। কুক্ষণে নয় বাবা! শুভক্ষণে দর্শন হয়েছিল। এরপর বুঝ্‌তে পারবে। হতাশ হয়ো না।

আমি। আপনি কি এখানে একা আছেন না শিষ্যও সেবায় আছেন ?

সন্ন্যাসী। আমি একাই থাকি বাবা। তোমার ত কিছু খাবার দরকার নেই ? ঐ পাশের গুহায় গিয়ে শুয়ে থাকগে, আবার সকালে দেখা হবে। এখানে বাঘ ভালুকের ভয় নেই।

আমি পাশের গুহায় গিয়ে শোবামাত্র অচেতন হলাম। স্বপ্ন দেখলাম, মা বলছেন—"আর দুঃখ করিস না বাবা ; তোর সুদিন আর বেশী বিলম্ব নেই। তুই আমাদের বংশ পবিত্র করেছিস, এইবার পূর্ব্বপুরুষেরা সব মোক্ষ পাবেন।" স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও চোখ বুজে রইলাম। যদি আবার মাকে দেখতে পাই কি আরও কিছু বলেন। কিন্তু আর দেখতে পেলাম না, কোন কথাও শুনলাম না। বাহিরে এসে সন্ন্যাসীর গুহায় ঢুকে দেখলাম তিনি ধ্যানস্থ। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বাইরে তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি বাইরে এলেন। আমি প্রণাম করলাম, তিনি নারায়ণ বলে প্রতিনমস্কার করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, খাবার জন্যে ছট্ ফট্ করছ, আচ্ছা যাও। নদীর ওপর দিয়ে আর যেও না, এই সামনে থেকে পার হয়ে, বরাবর পশ্চিম মুখে যাও। ভয় নেই, নদী বরফে ঢাকা পড়েছে, বরফ সরবে না।" আমি আবার তাঁকে প্রণাম করে, বরফের ওপর দিয়ে পার হয়ে পাহাড়ে উঠ্‌লাম।

আট দশ দিন পাহাড়ে পাহাড়ে সোজা পশ্চিম মুখে এসে, একদিন সন্ধ্যের সময় একটি গুহায় ঢুকে, বোধ হল একজন কে বসে আছে। আমি কিন্তু তখন বললাম কে ? কিন্তু উত্তর পেলাম না, কেবল ফোঁস ফোঁসানি শব্দ শুনতে পেলাম। কাছে গিয়ে বললাম "তুমি যেই হও বাইরে এস।" তবুও তার নড়ন চড়ন নেই কেবল কান্না। আমি অধৈর্য্য হয়ে বললাম যদি কথার উত্তর না দাও কি বাইরে না এস, আমি জোর করে তোমায় টেনে বার করব। তখন সে হিন্দী কথায় কাতরস্বরে বল্লে "আমি বড় অভাগিনী, আমায় ডাকাতে ধরে এনেছে।" আমি তার কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম, এই অজগর বনে ডাকাত বাস করে, তা হলে লোকালয় নিকটে।

আমি। ডাকাতেরা কোথায় ?

স্ত্রী। তা জানি না।

আমি। তোমায় কত দিন এনেছে ?

স্ত্রী। আজ চার দিন।

আমি। এখান থেকে সহর কতদূর ?

স্ত্রী। জানি না।

আমি। তুমি কি খাও ?

স্ত্রী। আজ সকালে একজন আমায় এখানে রেখে চাটি চিঁড়ে, ছাতু আর এক কলসী জল দিয়ে গেছে।

আমি। এর আগে কোথায় রেখেছিল ?

স্ত্রী। কোথাও রাখে নি, সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে, সন্ধ্যে হলে এই রকম একটা গুহার ভেতর সমস্ত রাত্তির রাখ্‌ত, আবার সকালে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত।

আমি। তোমায় কোথায় কেমন করে পেয়েছিল ?

স্ত্রী। আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি করে, আসবার সময় আমায় ধরে এনেছে।

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে থাক, তোমার উদ্ধারের চেষ্টা দেখছি। আজ রাত্তিরে ত আর কিছু হবে না, সকালে যা হয় করব।

আমি গুহার মুখে লম্বা হয়ে শুয়ে সমস্ত রাতটা কাটালাম। সকালে উঠে পাহাড়ের ঝরণায় হাত মুখ ধুয়ে আবার সেখানে ফিরে এলাম, তখন রোদ উঠেছে। স্ত্রী লোকটি বাইরে এসে বসে আছে। বয়েস বড় বেশী বলে বোধ হল না, উনিশ কি কুড়ি বছর হবে। দেখতেও মন্দ নয়, ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই বোধ হ'ল। সে আমায় দেখে এক হাত ঘোমটা দিল, আমারও তার স্নমুখে যেতে একটু লজ্জা বোধ হয়েছিল, কারণ তখন আমি দিগম্বর। আমি কাছে এসে বললাম "মা! আমায় লজ্জা করতে হবে না, আমি তোমার ছেলে। নিকটে ঝরণা আছে, হাত মুখ ধুয়ে এস, তার পর তোমার বৃত্তান্ত শুনব।" সে ঝরণার দিকে গেল ; আমি এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে একজন সাধুকে কাঠ সংগ্রহ করতে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার করলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

আমি। অনেক দূর থেকে, আপনার আশ্রম কি নিকটে ?

সাধু। আমাদের এই পাহাড়ের নীচে ?

আমি। এখান থেকে সহর কতদূর ?

সাধু। প্রায় চল্লিশ ক্রোশ হবে।

আমি। আপনি কি একা থাকেন ?

সাধু। না, আমরা কুড়ি বাইশ জন আছি।

আমি। এই পাহাড়ে কি ডাকাতের আড্ডা আছে?

সাধু। কৈ না, আমরা ত দিন রাত এই পাহাড়ে ঘুরি, কখন অন্য কোন লোককে দেখিনি। কেন বলুন দেখি?

আমি সেই স্ত্রীলোক সংক্রান্ত সমস্ত বললাম, তিনি শুনে বললেন, চলুন তাঁকে আপাততঃ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে রাখি, সুবিধেমত তাঁর বাড়ী পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।"

আমি। যদি ডাকাতেরা এসে পড়ে, আমাদের বিপদে পড়তে হবে, আরো দু-একজন সঙ্গে নিলে ভাল হয়।

সাধু। কিছু আবশ্যক নেই চলুন।

আমি অগ্রসর হলাম, তিনি আমার পেছনে গুহা পর্য্যন্ত এলেন। আমি স্ত্রীলোকটিকে ডাকিবামাত্র সে বেরিয়ে এসে বল্লে "বাবা! আপনারা পালান, তাদের লোকজন এসেছে, ঐদিকে গেছে।" আমরা একটু আড়ালে গিয়ে অনেকক্ষণ তার অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু সে ফিরে এল না দেখে, আমরা বেরিয়েই তাকে দেখতে পেলাম। তার হাতে একটা বর্শা। কাপড় চোপড় ভদ্রলোকের মত, চেহারাটাও ভদ্রলোকের মত, চোর ডাকাত বলে বোধ হয় না। আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এসে বর্শাটা মাটীতে রেখে আমাদের পায়ের ধূল নিলে, আমি সেই অবকাশে বর্শাটা আয়ত্ত করলাম। ডাকাতটা দেখেও দেখলে না, জিজ্ঞাসা করলে "বাবা! আপনাদের আশ্রম কি এখানে?"

সাধু। এই পাহাড়ের নীচে। তুমি এখানে কেন এসেছ?

ডাকাতটা অম্লানবদনে বল্লে, শীকার করতে এসেছি।

সাধু। তুমি একা শীকার করতে এসেছ, তোমার লোকজন সব কোথায়?

ডাকাত। লোকজন সব এদিক ওদিকে আছে, আমি ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি।

যে দিকে স্ত্রীলোকটি ছিল আমরা সে দিকে না গিয়ে নীচে নামবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। সন্ন্যাসী কতকগুলি কাঠ কুড়িয়ে বোঝা বেঁধেছিলেন; তিনি সেই বোঝাটি তুলতে যাবেন, ডাকাতটা বাধা দিয়ে নিজে বোঝাটা তুলে বললে "চলুন বাবা, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।" আমরা কোন আপত্তি করলাম না, কেবল দুজনে মুখ চাওয়া চাই করে মুচকী হাসলাম। তার উদ্দেশ্য যে আমরা অন্য দিকে না যাই, আর কিছু জানতে না পারি কিন্তু ফাঁদে ইচ্ছে করে পড়েছে তা জানে না। তার আরো সংবাদ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য ছিল, যে আমরা কিছু জানতে পেরেছি কিনা, কিন্তু আমরা সে বিষয় একেবারে উত্থাপন করলাম না। সে আমাদের আশ্রমে এসে বোঝাটা ফেলে বসল। আমরা তাকে বসতে বলে একটা কুঁড়ের ভেতর গিয়ে কি করা কর্তব্য পরামর্শ করতে লাগলাম। সাধুটি বললেন, ওকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না, বন্দী করে সহর কোতোয়ালকে খবর দেওয়া যাক।

আমি। তা যদি পারেন তা হলে পাপিষ্ঠদের উপযুক্ত শাস্তি হয়।

সাধু। গুরুদেবকে জানান আবশ্যক।

আমি। ও কি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে?

সাধু। যদি না করে বলপ্রয়োগ করতে হবে।

আমি। যা ভাল বোঝেন করুন। স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করতেই হবে, আমি তাকে কথা দিয়েছি।

সাধু। নিশ্চয়, আপনি ওকে দেখুন, যেন চলে না যায়। বলে আর

একটী কুটীরে ঢুকলেন। আমি সেই লোকটার কাছে এসে বসে গল্প জুড়ে দিলাম।

সন্ন্যাসী কুটীর থেকে বেরিয়ে তাকে কুটীরের ভেতর যেতে বলে দিয়ে, আর তিন জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে পাহাড়ে চলে গেলেন, আমি সেই খানে বসে রইলেম। কুটীরের মধ্যে তার কথা শুনতে পেয়ে আমি কাছে গিয়ে শুনলাম, সে বলছে "আমি কোন মেয়ে মানুষের খবর টবর জানি না, আমি শীকার করতে এসেছি।"

গুরু। ভাল—তুমি যদি তার বিষয় কিছু না জান, আমার লোক তাকে আনতে গেছে, সে যদি বলে তোমায় চেনে না, তা হলেই তোমার রেহাই। তারা যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ তোমায় থাকতে হবে।

লোকটা একটু উত্তেজিত হয়ে বললে "আমি যদি না থাকি—আমায় কি জোর করে ধরে রাখা হবে ?"

গুরু। যদি দরকার হয় ধরে কেন বেঁধে রাখা হবে।

এ কথা শোনা মাত্র সে দাঁড়িয়ে উঠে সদর্পে—"আমায় ধরে রাখে এমন লোকত এ তল্লাটে আছে বলে মনে হয় না।" বলে বেরবার মতলবে যেমন পেছন ফিরেছে, গুরুদেব অমনি হাততালি দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে চারজন খুব বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী দোরের কাছে এসে বললে "বাবা, আদেশ করুন।"

মোহন্ত। এই লোকটাকে আটক কর যেন পালাতে না পারে।

তারা ধরবার জন্যে যেমন এগিয়েছে, সে চক্ষের নিমিষে একখানা ছোরা বার করে তুলে ধরলে। সূর্য্যের কিরণে ছোরাখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। সন্ন্যাসীরা পেছিয়ে দাঁড়াল। সে সেই ভাবে ছোরা হাতে বেরিয়ে এল। আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আমায় দেখতে পায় নি,

আমি একটা সিদ্ধি ঘোঁটা নিমের কাঠ সেখানে পড়ে ছিল, কুড়িয়ে সজোরে তার হাতে কসিয়ে দিলাম। ছোরাখানা হাত থেকে ছুটকে পড়ল, আর অমনি সন্ন্যাসীরা জড়িয়ে ধরলে। দড়ি এনে তখুনি তার হাত পা বেঁধে, গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। দুজন লাঠী হাতে পাহারায় রইল।

মহন্তজি বাইরে এসে শিষ্যদের বললেন "একটা কুটীরে ওকে ভাল করে বেঁধে রাখ, আর খুব সাবধানে থাকবে যেন পালাতে না পারে।" তারা তাকে একটি কুটীরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলে।

মোহন্তজির বয়েস হয়েছে, চুল দাড়ি সাদা ধপ্‌ধপে, শরীরটিও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। আমায় ইসারা করে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথা হতে আসছি।

আমি। পূর্ণিমেশ্বর শিব দর্শন করে এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, গুহার মধ্যে স্ত্রীলোকটিকে দেখে, তার উদ্ধার মানসে, সাহায্য পাবার ইচ্ছায় এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আপনার শিষ্যের সঙ্গে দেখা হল, তাঁকে সমস্ত বলায় তিনি সঙ্গে করে এখানে এনেছেন।

মোহন্ত। আপনার আশ্রম কোথা ?

আমি। যখন যেখানে থাকি তখন সেইখানে আশ্রম হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই।

মোহন্ত। আপনি কোন্ পন্থি ?

আমি। পন্থাপন্থি জানি না খালি ঘুরে বেড়াই।

মহন্ত। আপনার গুরুর নাম বলবেন কি ?

আমি। জানি না, তবে তাঁর এক শিষ্যের নাম কালিকানন্দ, আর একজনের নাম ব্রহ্মানন্দ।

মোহন্তজী আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন "তুমি আমার গুরুভাই, আমার নাম নিরঞ্জানন্দ। তোমার নাম কি ভাই?"

আমি। বাপ মা জগবন্ধু নাম রেখেছিলেন।

তিনি খুব আদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কিছু খাবে কি?" আমি কিছু খাব না বলায় খুব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন "কি রকম?"

আমি। আজ প্রায় একমাস হতে চলল, একজন সন্ন্যাসী, পরে জানতে পারলাম, গুরুদেব, একটী শেকড় দিয়েছিলেন, সেইটি খাওয়া অবধি আর খিদে তৃষ্ণা নেই।

যাঁরা সেই স্ত্রীলোকটীকে আনতে গিয়েছিলেন, তাঁরা স্ত্রীলোকটীকে আর একজন খুব বলবান লোককে বেঁধে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। মোহন্তজী স্ত্রীলোকটিকে একটী কুটীরে যেতে বলে, লোকটাকে কাছে আনিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন "তোমরা কোথায় থাক, আশ্রমের শান্তি নষ্ট করতে কেন এখানে এসেছ?" লোকটা কোন উত্তর দিলে না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাকে অনেক রকম করে প্রশ্ন করা হল, কিন্তু সে একটা কথাও বললে না, হাবাকালার মতন কেবল একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তাকে অন্য একটী কুঁড়েয় রাখতে বলে, তাঁর একজন শিষ্যকে ডেকে বললেন "তুমি এখুনি সহরে গিয়ে, থানাদারকে খবর দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এস, আজই ফেরা চাই, বুঝলে?" সে যে আজ্ঞে বলে চলে গেল।

আমি। সহর এখান থেকে কতদূর?

মোহান্ত। বনে বনে গেলে ক্রোশ চেরেক, আর রাজপথে আট ন ক্রোশ। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে যাবে। চল একবার মেয়েটীর খবর নেওয়া যাক।

আমরা স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তার খাওয়া হয়েছে কিনা। সে হাত নেড়ে জানালে হয় নি। মোহান্তজী একজন শিষ্যকে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার বাড়ী কোথা মা? লজ্জা করো না, আমরা তোমার ছেলে। তুমি আমাদের মা।"

স্ত্রী। বিজয়নগর।

মোহান্ত। তোমায় এরা কেমন করে পেয়েছিল?

স্ত্রী। আমাদের বাড়ী ডাকাতি করে আমায় ধরে এনেছে।

মোহান্ত। বিজয়নগর এখান থেকে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ। কবে ডাকাতি করেছিল?

স্ত্রী। আজ শুক্রবার ত, আজ সাতদিন, গেল শনিবারে।

মোহান্ত। তোমাদের কি লুট করেছে?

স্ত্রী। সর্ব্বস্ব, পথের ভিকিরি করেছে। মেয়েদের গা থেকে গয়না, পরণের কাপড় পর্য্যন্ত খুলে নিয়েছে। আমি আমাদের গোলার পাশে লুকিয়েছিলুম, সেখান থেকে আমায় টেনে বার করে ধরে এনেছে। বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। মোহান্ত তাকে সান্ত্বনা করতে করতে বললেন "কেঁদ না মা, আমি তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দোব।" বাড়ীর নাম শুনে আরো কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "আমায় ডাকাতে ধরে এনেছে, বাড়ীতে কি আর যায়গা দেবে?"

মোহান্ত। যাতে নেয় সে বন্দোবস্ত আমি করে দোব। তোমার উপর কোনরূপ অত্যাচার করেনি ত?

স্ত্রী। না—এতদিন কেবল এরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে, এক জায়গায় ত স্থিতি হতে পাচ্চে না, তাই রক্ষে পেয়েছি।

মোহান্ত। আচ্ছা, তুমি খাওয়া দাওয়া কর, দেখি কি করতে পারি বলে আমরা বাইরে এলাম। তিনি ডাকাতদের খাবার দিতে বল্‌লেন।

আমি। ওদের কি খেতে দেবেন ?

মোহান্ত। নারায়ণের কৃপায় আর গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে ভাঁড়ারে সব আছে। ওদের দুখান পুরি আর একটু হালুয়া দেবে, চল একটু বিশ্রাম করবে।

আমরা কুটীরের ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অনেক লোকের কোলাহল শুনে বাহিরে এসে দেখি প্রায় পনেরজন পুলিশের লোক এসেছে। ডাকাত দুটোকে সেইরকম বাঁধা অবস্থায় বাইরে আনা হ'ল। দারোগা তাকে দেখেই বল্লেন "এই লোকটাকে ধরবার জন্যে কোম্পানী বাহাদুর দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এ প্রায় একশ ডাকাতি আর খুন করেছে, এর নাম মহাবীর সিং, বাড়ী বিজয়নগর। আপনি সরকার বাহাদুরের বড্ড উপকার করেছেন। যাতে পুরস্কার আপনাকে দেওয়া হয়, আমি সে চেষ্টা করব।" মোহান্তজী আমায় দেখিয়ে দিয়ে হেসে বল্‌লেন "ইনি এদের ধরেছেন, পুরস্কার এঁরই পাওনা।"

দারোগা আমায় উলঙ্গ দেখে বল্‌লেন "বাবা ত নেংটা, উনি কি পুরস্কার নেবেন ?"

আমি। আমার কিছুই আবশ্যক নেই। সরকার বাহাদুর যদি পুরস্কার দেন, আমার হয়ে তুমি অর্দ্ধেক নিও আর বাকী এই মেয়েটিকে দিও।

দারোগা। মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী আপনি, আপনার থাওয়া আবশ্যক।

আমি। আমি বাপু লোকালয়ে যাচ্ছি না। আমার জবানবন্দী আমি লিখে দিতে পারি, ইচ্ছে হয় কাগজ কলম দাও লিখে দিচ্ছি।

দারোগা অনেক অনুনয় বিনয় করলে কিন্তু আমি কাণই দিলাম না। যখন বলে কয়ে দেখলে আমি রাজী হলাম না, তখন কাগজ কলম দিলে। আমি সমস্ত লিখে দারোগার হাতে দিয়ে বললাম "পুরস্কারের বিষয়টাও লিখে দিয়েছি।" দারোগা পড়ে খুব খুসী হয়ে আমাদের প্রণাম করে বল্লেন "যদি দরকার হয় আপনার শিষ্যদের সদরে যেতে হবে।" তাঁরা দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

আমি সেখানে তিন চার দিন ছিলাম। এক যায়গায় বেশীদিন থাকতে আমার ভাল লাগত না—তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন একটি শিষ্য ঝরণা থেকে একখানা পাথর কুড়িয়ে এনে মোহান্তের হাতে দিয়ে বল্লে "জলের ভেতর চক্‌মক্ করছিল, দেখে কুড়িয়ে এনেছি।" তিনি উল্‌টেপাল্‌টে দেখে বল্লেন "ভাল সাঁচ্চা পাথর বলে বোধ হচ্চে। থাক, যখন সহরে যাওয়া যাবে কোন জহুরীকে দেখান যাবে। আমার বোধ হয় এর বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দাম হবে।"

আমি থাকতে না পেরে বললাম—"আপনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনার ওতে দরকার কি? এখনও কাঞ্চনে লোভ আছে?"

মোহান্ত। কাঞ্চন না হলে ধর্ম্ম হয় না, তা ছাড়া পোড়া পেট ত আছে।

আমি। অর্থ সংসারীর দরকার বটে, তাদের অর্থ না হলে চলে না, ধর্ম্ম কর্ম্মও হয় না, কিন্তু আমাদের মত বুনোদের কোন আবশ্যকই নেই। পেটের জন্তে অর্থের দরকার কি? দেখুন প্রায় এগার বছর আমি বনে বনে ঘুরছি, কৈ একদিনের তরেও ত আমার পেট খালী ছিল না। অর্থই যত অনর্থের মূল।

মোহান্ত। তুমি ভাই মহাপুরুষ, তোমার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

আমি। ঠাট্টা করছেন কেন, সত্য বলছি—আমি একবেলাও উপোষ করিনি।

তিনি কথা কইলেন না, বোধ হল অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর সন্তোষে বা অসন্তোষে আমার কিছু এসে যায় না। আমার কোন বালাই নেই। প্রায় একমাস হতে চলল খিদে কাকে বলে জানি না। জঠর-যন্ত্রণা ভুলে গেছি। তাঁরাও আমি কিছু খাই না দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। আমি তার পরদিন বিদেয় নিয়ে বেরুলাম।

পঞ্চদশ অঙ্ক

মাসখানেক ঘোরার পর একদিন সকালে গুহা থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে পাহাড় থেকে নামতে নামতে, পাহাড়ের ওপর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর দেখ্‌তে পেলাম। কুটীরের দাওয়ায় তপ্ত কাঞ্চনের মত গৌরবর্ণ একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুঁথি পাঠ করছেন, আর তাঁর পাশে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক লাউ কুট্‌ছেন। তাঁরও বয়েস হয়েছে কিন্তু তাঁর মতন ভুবনমোহন রূপ মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না, দেবীতেই সম্ভব। ও রকম রূপ কবি কল্পনাতেও আনতে পারেন না। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম, ভক্তিতে আমার মাথা আপনি নুয়ে গেল। তিনি হেসে আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্‌লেন। আমি দাওয়ার ওপর উঠে বসলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "চা খাবে?"

আমি এই অজগর বনে চায়ের নাম শুনে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম। আমার মনের ভাব জান্তে পেরে বল্লেন "বাবা! যখন চার চাল্ বেঁধে ঘর করেছি, তখন সংসারীর যা কিছু দরকার আছে। আমার এই গৃহিণীটি অন্নপূর্ণা, যা চাবে তাই পাবে।" আমি কি তখন জানি যে স্বয়ং অন্নপূর্ণা আমায় ছলনা করতে কুটীর বেঁধেছেন!

আমি। এই বনের মধ্যে চা পাওয়া কি শক্ত নয় বাবা?

বৃদ্ধ। কিছু নয় বাবা! আমার ভক্তেরা দেয়। গিন্নী, জগবন্ধুকে একটু চা আর কিছু খাবার দাও। এক মাসের ওপর ও কিছু খায় নি যে।

আশ্চর্য্যের ওপর আরো আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা! আমার নাম জান্লেন কি করে?"

তিনি হেসে বল্লেন—"তোমার নাম জানি বাবা।"

গিন্নী একখানি রূপার রেকাবে খানকতক ফুল্কো লুচি, খানিকটা হালুয়া আর এক বাটি চা আমার সুমুখে রেখে বললেন—"খাও বাবা।"

আহা, কি মিষ্টি কথা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আমি বল্লাম—"মা, আমি খেতে পারব না, আমার খিদে নেই।"

তিনি হেসে বল্লেন—"আমি বুঝতে পারছি, তোমার খিদে পেয়েছে, খাও।"

আমি একখানা লুচি ছিঁড়ে মুখে দেবামাত্র খিদেয় অস্থির হয়ে, সব ক'খানা, একতাল হালুয়া আর চা টুকু খেয়ে সুস্থ হলাম।

বৃদ্ধা। কেমন বাবা—খিদে পেয়েছিল ত?

আমি। তাই ত মা! এতদিন খিদে তেষ্টা ভুলে গেছলাম, কোন বালাই ছিল না, বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

বৃদ্ধ। আর বড় বেশী দিন ঘুরতে হবে না। এইবার নেমে লোকালয়ে যাও, গুরুদর্শণ পাবে।

তাঁর কথা শুনে আমার মন ফিরে গেল। ইচ্ছে হল আর বনে বনে ঘুরব না। জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা, এখান থেকে লোকালয় কতদূর ?"

বৃদ্ধ। অনেক দূর—তুমি এখান থেকে বরাবর পশ্চিম দিকে যাও, তা হলে পাঁচ সাত দিনের পর লোকালয় পাবে। এখন যাও, কুঁড়ের পেছনে পুকুর আছে, স্নান করে এস।

তাঁর আদেশ মত কুঁড়ের পেছনে গিয়ে দেখলাম একটি সুন্দর ছোট্ট পুকুর। জল যেন কাকের চক্ষু, আর এত পরিষ্কার যে একেবারে তলা পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমি জলে নেমে বেশ করে অবগাহনে স্নান করলাম ও প্রাণ শীতল হয়ে গেল। জল থেকে উঠে সেইখানে চোক বুজে ইষ্টদেবীর ধ্যান করতে মানস-চক্ষে কুঁড়ের বৃদ্ধা হাস্যবদনা, বরাভয়করা ভেসে উঠ্‌লেন। চোখ খুলে ফেললাম। বেশ করে চোখে মুখে জল দিয়ে, আবার চোখ বুজলাম, আবার তাই। ভাবলাম একি হল ? আজ মা কেন এমন হচ্চে ? কিন্তু কিছুতেই ইষ্টদেবীকে ধ্যানে আনতে পারলাম না। মহামায়া এমন মায়ায় আবদ্ধ করেছিলেন যে একবারও মনে হল না যে যাঁর ধ্যান করছি তাঁর রূপের সঙ্গে বৃদ্ধার রূপের ত কিছু প্রভেদ নেই। যদি মনে হত তা হলে এমন করে আর জগতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত না। বিরক্ত হয়ে জপ করলাম, প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এমন সময়ে বৃদ্ধা বল্‌লেন—"বাবা উঠে এস, ভাত হয়েছে।" আমি প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে কুঁড়েয় এলাম।

তিনি রূপর থালায় ভাত, রূপর বাটীতে ডাল, মাছ, মাংস, তিন চার-

খানা তরকারি আমার সুমুখে ধরে দিলেন। আমি আর কিছু দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করায়, ঘরে ঢুকে দই আর সন্দেশ এনে পাতে দিলেন। আমি চোখ বুজে নিবেদন করবার সময় বোধ হল, তিনি আমার পাত থেকে চাটি ভাত আর একটু তরকারী তুলে মুখে দিচ্চেন। সে সময়ও জ্ঞান হয়নি যে সাক্ষাৎ আত্মাশক্তি আমায় খাওয়াচ্ছেন। আমি জয় অন্নপূর্ণা বলে প্রসাদ পেলাম। কি অমৃতই যে খেলাম তা বলতে পারি না। খেয়ে দেয়ে আমি এঁটো তুলতে যাচ্ছি, আমায় তুলতে দিলেন না। পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে আসবামাত্র আমায় একটি পান দিলেন। আমি হাতে নিয়ে বল্‌লাম "আমি পান খাই না।" তিনি বল্‌লেন—"একটা খাও।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বদনে দিলাম। পান চিবুতে চিবুতে এত ঘুম এল যে আর বসে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়লাম, যেমন শোয়া অমনি অঘোর অচৈতন্য। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তা জানি না, গায়ে চড়্‌চড়ে রোদ লাগতে উঠে বসলাম। আমি পাহাড়ের ওপর একখানা পাথরের ওপর খোলা যায়গায় পড়ে আছি। সে কুঁড়েও নেই, সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীও নেই। যেন ভেল্কীবাজী দেখলাম। বসে বসে খুব হাসলাম, মনে মনে বল্‌লাম—মা, কত খেলাই খেল্‌ছিস, এমন করে ছলনা কেন যে করছিস্ তা ত বুদ্ধিতে আসে না। তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বসে ভাবছি কি করি, বেলাও ত পড়ে আসছে, কোথায় যাই— না—আজ আর কোথাও যাব না, এইখানেই থাকব। এমন সময় কালিকানন্দ হাসতে হাসতে সুমুখে দাঁড়িয়ে বললেন "কি ভাবছ ভায়া— হতভম্ব হয়ে গেছ যে, এবারেও ঠকিয়ে গেল।"

আমি। তোমাদের ব্যবসাই ওই, আমার মতন লোককে ঠকাবে তার আর বাহাদুরী কি?

কালি। একটু তলিয়ে দেখলেই ত বুঝতে পারতে, শিবশক্তি কৈলাস ছেড়ে তোমার জন্যে এখানে এসে কুঁড়ে বেঁধেছিলেন, এ সামান্য বুদ্ধিতে যোগাল না?

আমি। কেমন করে বুঝতে পারব? আর বুঝতে দেবেনই বা কেন। মায়ায় বুদ্ধি সুদ্ধি কি ছিল?

কালি। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথম—এই বনের মধ্যে চা কোথায় পেলে। দ্বিতীয়, যখন জপ করছিলে সুমুখে বরদারূপে কাকে দেখেছিলে। তৃতীয়, ভাত নিবেদন করবার সময় দেখেছিলে ত ব্রাহ্মণী তোমার পাত থেকে একটু একটু করে সব মুখে দিচ্ছিলেন। সামান্য একটু ভেবে দেখলে, আর জপ তপ করতে হত না।

আমি। কিছুই বুঝতে দেয় নি, মায়ায় বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল। তখন কি আমাতে আমি ছিলাম না জ্ঞান-গোচর কিছু ছিল?

কালি। এখন যা বলেছেন করগে। নীচে নেমে লোকালয়ে যাও।* তাঁদের খেলা আমরা দেখছিলাম।

আমি। এটা কি মাস বলতে পার? আমরা কে কে?

কালি। কার্ত্তিক মাস পড়েছে। বাবা আর আমি।

আমি। তাই একটু শীত শীত কচ্চে। আচ্ছা—কোন্ দিকে গেলে লোকালয় পাব?

কালি। উত্তর পশ্চিম মুখে বরাবর চলে যাও, দিন দশ বার পরে পাহাড় থেকে নামলেই লোকালয় পাবে।

আমি। কোথায় গিয়ে পৌছব?

কালি। আমি যেমন বলে দিলাম, ঠিক উত্তর পশ্চিম মুখ ধরে গেলে বিন্ধ্যাচলের কাছাকাছি নামতে পারবে। মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে যেও,

এবার কুম্ভের মেলা হবে। ঠাকুর ত্রিবেণী স্নান করতে যাবেন, সেইখানে দেখা হবে।

আমি। শুনেছি কুম্ভের মেলায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তাঁকে কেমন করে চিনতে পারব?

কালি। এরি মধ্যে ভুলে গেছ? তিনি সবচিন্, দেখলেই চিন্‌তে পারবে।

আমি। যদি এই রকম মায়ায় আচ্ছন্ন করেন, চিন্‌তে না দেন?

কালি। আমিও ত যাব, যদি নিষেধ না করেন চিনিয়ে দোব। এখন আমি চল্লাম, ঐ দিকে একটা গুহা আছে, রাতটা সেইখানে কাটিও। এই ফলটা রেখে দাও রাত্তিরে খেও।

আমার হাতে একটি ফল দিয়ে অন্তর্ধান হলেন। আমি ফলটি হাতে করে খানিক দূরে একটি গুহা দেখে, তার ভেতরে ফলটি রেখে বাইরে এসে বসে শিবরাণীর ছলনার বিষয় ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে হল, গুহার ভেতরে গিয়ে বসলাম।

ষোড়শ অঙ্ক।

বার দিন পরে সন্ধ্যের সময় পাহাড় থেকে নামলাম। একজন লোক পাহাড়ের নীচে ক্ষেতে কাজ করছিল। আমাকে দেখে সসব্যস্তে উঠে আমার কাছে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। সে আমায় উলঙ্গ আর সবচুলো দেখে মনে করেছিল একজন

মহাপুরুষ পেয়েছি। মহাপুরুষের সেবা যত্ন করলে রাজা করে দিতে পারেন।

আমি। এটা কোন্ যায়গা?

সে একটা গাঁয়ের নাম কর্‌লে, বুঝতে পার্‌লাম না সেটা কোথায়। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এখান থেকে কাশী কতদূর?"

চাষা। অনেক দূর।

আমি। প্রয়াগ কতদূর?

চাষা। অনেক দূর?

আমি। বিন্ধ্যাচল?

চাষা। চার ক্রোশ পশ্চিমে।

আমি তাই না শুনে অমনি পশ্চিম মুখে পা বাড়ালাম। সে হাত জোড় করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি কি চায় জিজ্ঞেস করায় সে বল্লে আজ দয়া করে তার বাড়ী পায়ের ধূল দিলে কৃতার্থ হবে। আমাদের বাঙ্গালার চেয়ে এ দিকের লোকদের সাধু ফকিরের ওপর খুব ভক্তি আর বিশ্বাস আছে। বাঙ্গালায় এক মুঠ ভাতের জন্যে কত যায়গা থেকে বিমুখ হয়ে, তবে কচিৎ কেও যদি দয়া করে দেয়। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের কাছে তাড়না খেতে হয়। দয়া যদি পাওয়া যায় সে নিরক্ষর চাষাভুষোর কাছে। আমি অজানা যায়গায় রাত্তিরে কোথায় আশ্রয় পাব কিনা ভেবে তার আতিথ্য স্বীকার করে তার সঙ্গে বাড়ী গেলাম। বাড়ীটি দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লক্ষ্মী-শ্রী আছে। অনেকগুলি গরু আর মহিষ বাঁধা রয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একখানা কম্বল এনে বাইরের আটচালায় পেতে দিলে। আমি বসলে, হাতজোড় করে জিজ্ঞেস করলে তামাক কি গাঁজা আনব? আমি

নিষেধ করে বললাম "ও সব কিছু দরকার নেই, আমি খাই না।" আমার কাছে অনেকক্ষণ বসে গল্প করে খাবার কথা পাড়লে। আমি তাকে বললাম, যা ভক্তি করে দেবে তাই খাব। সে বাড়ীর ভেতর গিয়ে এক ঘটি জল আর একখানা ঐ দেশী কানা উঁচু থালায় চারটি চিঁড়ে এনে রেখে আবার গিয়ে এক বাটি দুধ আর খানিকটা গুড় এনে হাতজোড় করে বললে, বাবা, আমি বড় গরীব, ঘরে যা ছিল তাই এনে হাজির করেছি, কৃপা করে ঠাকুরের ভোগ দিন। আমি তাকে আপ্যায়িত করে বললাম "এ খুব ভাল লক্ষ্মী-শ্রী, আমি তোমার ভক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।" চিঁড়ের ফলার করে শোবার আয়োজন কচ্ছি, এমন সময় তার ছেলে আর একখানা কম্বল এনে বললে "বাবা, রাত্তিরে শীত করবে, এখানা গায়ে দেবেন।" তথাস্তু বলে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে বসেছি, চাষী বেরিয়ে এসে আমায় প্রণাম করলে, আমি বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলাম তার কটি ছেলে পিলে।

চাষী। আপনার কৃপায় আমার আর অন্য কিছুরই অভাব নেই, কেবলমাত্র একটি ছেলের অভাব। আমার কোন সন্তানাদি হয় নি।

আমি। কাল যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম, কম্বল দিয়ে গেল, সেটি তোমার ছেলে নয়?

চাষী। আজ্ঞে না, সে আমার ভাগ্নে।

হাতজোড় করে গলায় কাপড় দিয়ে আবার বল্লে "বাবা যদি কৃপা করেন তা হলে আমি একটি ছেলের মুখ দেখতে পাই, আর আপনার গুণ চিরকাল গাইব।"

আমি। আচ্ছা, আমি তোমায় ছেলে হবার ওষুধ দিচ্ছি বলে

মাঠ থেকে একটা শেকড় তুলে এনে তাকে দিয়ে বল্লাম "দুধ আর গঙ্গাজল দিয়ে বেটে তোমার স্ত্রীকে থাইও, গুরুর কৃপায় তোমার ছেলে হবে।" আমি ব্রহ্মানন্দের কাছে কতগুলি ওষুধ শিখেছিলাম। সে খুব ভক্তি করে নিয়ে বাড়ীর ভেতর দিয়ে এল। আমি তাকে বল্লাম এইবার আমি চল্লাম।

চাষী। হাতজোড় করে "বাবা, অপরাধ মাফ করবেন, এ রকম নেংটা যাওয়া ভাল দেখায় না, একখানা কাপড় এনে দি পরুন" বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুতপদে ভেতর থেকে একখানা নতুন কাপড় এনে আমায় দিলে। আমিও ভেবে দেখলাম "সত্যিই ত যখন লোকালয়ে এসেছি, তখন নেংটা থাকা উচিত নয়।" কাপড় খানা থেকে একটা কপনীর মত টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে, বাকিটা তাকে ফেরত দিলাম। কপনী পরে যাবার জন্তে পা বাড়িয়েছি, সে আবার হাতজোড় করে কম্বলখানা সঙ্গে নিতে অনুরোধ করলে। আমি অস্বীকার করায়, খুব কাকুতি মিনতি করতে লাগল। তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে একখানা কম্বল কাঁধে ফেলে দুর্গা শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়লাম। কাঁধে কম্বল, কোমরে কপনী বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ইচ্ছে করছিল ফেলে দিয়ে যেমন ঝাড়া গায়ে বেড়াচ্ছিলাম সেই রকম বেড়াই। কিন্তু এ যে লোকালয়, এখানে ওসব চলে না, হয়ত পুলিশের গুঁত খেতে হবে, তাই পারলাম না। পথে এক জায়গায় একজন আধসের টাক দুধ দিয়েছিল, তাই আহার করে বেলা দুটর সময় বিন্ধ্যাচলে পৌছেছিলাম।

বিন্ধ্যাচল রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম "কাশীর গাড়ী কখন পাওয়া যাবে?" ষ্টেশন মাষ্টারটি বাঙ্গালী,

আমায় আদর করে, একখানা চেয়ারে বসিয়ে বল্লেন "রাত্তির নটার সময়, এখন ত ঢের দেরী আছে। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

আমি। কাল পাহাড় থেকে নেমে একজন ভক্তের বাড়ী রাত্তিরে ছিলাম। আজ সেইখান থেকে আসছি।

ষ্টেশন মা। আজ তা হলে খাওয়া দাওয়া হয় নি?

আমি। পথে একজন একটু দুধ দিয়েছিল।

ষ্টেশন মা। যদি অনুমতি করেন তা হলে আমি কিছু বন্দোবস্ত করি। আমি ব্রাহ্মণ, পরিবার নিয়ে আছি।

আমি। তাতে আমার আপত্তি নেই।

তিনি তখুনি বাসায় গেলেন। ষ্টেশনের কুলি খালাসিরা এসে আমায় ঘিরে ফেলে কতরকম কথা কইতে লাগল। একবছর নিরিবিলিতে একলা থেকে কেমন স্বভাব হয়ে গেছল, বেশী লোকজন কি বাজে কথা কওয়া ভাল লাগত না। তারা কেবল কতগুলো বাজে কথা কইতে লাগল, কেওবা বাবা আমার অমুকের এই ব্যারাম হয়েছে. কিছু ওষুধ দিন; কেওবা বল্লে আমি বড় গরীব, আমার যাতে খুব অর্থাগম হয় করুন। আমার বড় বিরক্ত বোধ হওয়ায় আমি উঠে একজন খালাসীকে বিন্দুবাসিনীর মন্দির কোন্ দিকে আর এখান থেকে কত দূর জিজ্ঞাসা করে সেই দিকে যাবার আগে তাকে বল্লাম "বাবুকে বলে দিও যে আমি বিন্দুবাসিনী দর্শন করতে যাচ্ছি, ঠিক সময়ে আসব।" যখন বিন্দুবাসিনীর মন্দিরে গিয়ে পৌছলাম, তখন মন্দিরের দরজা পড়ে গেছে, কিন্তু দর্শন করবার অসুবিধে হল না। ফিরে আসবার সময় দেখলাম যে ব্রহ্মানন্দের সেই শিষ্যটি, যাকে চুরী অপরাধে রাণা ধরে নিয়ে গেছলেন, সে সেখানে ধুনী জ্বালিয়ে জেকে বসে আছে। আমায়

দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে পায়ের ধুল নিয়ে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের আসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "বাবা! পাহাড় থেকে কবে নেমেছেন?" আমি তাকে সেখানে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, বল্লাম "সবে কাল নেমেছি।" আমায় প্রণাম করতে দেখে সেখানে যারা ছিল তারাও একে একে সকলে প্রণাম করলে। তারা মনে করেছিল যে সন্ন্যাসী যখন প্রণাম করছে, তখন আমি সাধারণ লোক নই। সে বসিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একজন লোককে গাঁজা তৈরী করতে বলে আমার জলখাবার আনতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কোথা যাচ্ছ?" সে বল্লে, "বাবার ভোগের জন্যে কিছু আনতে যাচ্ছি।"

আমি। কিছু দরকার নেই।

সন্ন্যাসী। তা কি হয় বাবা, যখন দেখা পেয়েছি তখন কিছু না খাইয়ে ছাড়্‌ছি না।

আমি। এ অবেলায় কিছু খাব না।

সে শুনলে না, বাজার থেকে দুধ আর পেঁড়া এনে সুমুখে রেখে একজনকে গঙ্গাজল আনতে বলে জিজ্ঞাসা করলে "আমাদের আশ্রম কতদিন ছেড়েছেন?"

আমি। প্রায় পাঁচ বছর।

সন্ন্যাসী। গুরুজী কি সহস্রারে লীন হয়েছেন?

আমি। তা বলতে পারি না, খবর পাইনি।

সন্ন্যাসী। কালিকানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় নি?

আমি। আসবার দিন বারো আগে দেখা হয়েছিল।

সন্ন্যাসী। তিনি কিছু বলেন নি?

আমি। না—আমি জিজ্ঞেসও করি নি।

সন্ন্যাসী। এখন কোথা যাবেন ?

আমি। একবার কাশী যাব, তারপর প্রয়াগে কুম্ভের মেলায় ঠাকুরের আসবার কথা আছে, সেখানে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করে যেমন আদেশ করবেন তাই করব।

সন্ন্যাসী। আমিও যাব মনে করেছি, একমাস এখানেই থাকব। এখানকার বড় পাণ্ডা আমায় বড় খাতির যত্ন করে।

আমি। এখন চল্লাম, প্রয়াগে দেখা হতে পারে।

সন্ন্যাসী। যাবার সময় এখান দিয়ে গেলে এক সঙ্গে যেতে পারতাম।

আমি। যদি সুবিধে হয় নামতে পারি।

সন্ন্যাসী। মনে থাকবে কি ?

আমি। তোমায় যাবা কথা দিতে পারি না বলে মন্দির থেকে বেরুলাম, সেও খানিকদূর সঙ্গে এসে, প্রণাম করে ফিরে গেল। আমি বরাবর ষ্টেশনে এলাম। ষ্টেশন মাষ্টার আমার অপেক্ষা করছিলেন। আমি আসামাত্র আমায় বাড়ী নিয়ে গিয়ে, লুচি তরকারি খিব খুব খাওয়ালেন। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম "বাবা, কই ছেলেপিলে দেখতে পাচ্ছি না ?"

ষ্টে মাঃ। আমার ছেলে পিলে হয় নি।

আমি। চেষ্টা চরিত্র করেছিলে কি ?

ষ্টে মাঃ। কি চেষ্টা করব বাবা! দেশে থাকতে মা অনেক বিষুধ করেছিলেন কিন্তু ফল হয় নি।

আমি। আমি একটি ওষুধ দেব, কাল সকালে মাকে গঙ্গাজল দুধ দিয়ে বেটে খেতে বোল, গুরুর কৃপায় ছেলে হবে।

ষ্টে মাঃ। যে আজ্ঞে।

আহারের পরে একটি লণ্ঠন নিয়ে ওষুধটা তুলে তাঁকে দিয়ে ষ্টেশনে এসে বসে রইলাম। গাড়ী এলে বিনা টিকিটে সেকেণ্ড ক্লাসে বসলাম। রাত্রির একটার সময় মোগলসরাইয়ে পৌঁছে কাশীর গাড়ীতে যাচ্ছি, একজন ফিরিঙ্গী টিকেট কলেকটার টিকিট চাইলে, আমি নেই বলায় সে ভাড়া চাইলে, আমি বল্লাম, তাও নেই, এই কম্বলখানা আছে, ইচ্ছে হয় নিতে পার।

টি ক। তাহলে পুলিশে দেওয়া হবে।

আমি। দাও।

টি ক। তোমার জেল হবে জান?

আমি। তাতে ক্ষতি কি, আমার এখানেও যা, জেলেও তাই।

আমায় ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে, আমি বিনা টিকিটে এসেছি, ভাড়াও দিতে অস্বীকার করছি। ষ্টেশন মাষ্টার একজন ইংরাজ, জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার টিকিট নেই।" আমি ইংরাজিতে বল্লাম "না—আমি সন্ন্যাসী, পয়সা কোথায় পাব?"

ষ্টে মাঃ। (হাসিতে হাসিতে) কোম্পানীর নিয়মমত কাজ করলে আপনাকে পুলিশে দিতে হয়।

আমি। আমি আপনাকে নিয়ম লঙ্ঘন করতে অনুরোধ করতে পারি না, তবে আপনি যখন এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, আপনি ইচ্ছা করলে ছেড়েও দিতে পারেন, পুলিশেও দিতে পারেন।

ষ্টে মাঃ। পুলিশে দিলে জরিমানা হবে, না দিতে পারলে জেল হবে।

আমি। আমার পক্ষে জেলেও যা এখানেও তাই। সংসার গারদের চেয়ে রাজার গারদ অনেক ভাল।

ষ্টেশন মাষ্টার আমার কথা শুনে খুসি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

আমি। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ঘুরছিলাম, কাল নেমে বিন্ধ্যাচল থেকে কাশী যাবার মানসে এসেছি।

ষ্টে মাঃ। আপনি ত সুন্দর ইংরাজি বলেন। এ পথে কতদিন এসেছেন?

আমি। বার বছর।

ষ্টে মাঃ। এর আগে কি করতেন?

আমি। ডাক্তারি করতাম।

ষ্টে মাঃ। তবে এ পথে এলেন কেন?

আমি। তা জানি না, সবই দৈবের খেলা। যেমন খেলাচ্ছেন তেমনি খেলচি।

ষ্টে মাঃ। আপনার সঙ্গে কথা কয়ে সুখী হলাম। এখন কাশীর গাড়ীর দেরী আছে, সকাল সাড়ে পাঁচটায় ছাড়বে, ততক্ষণ ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিশ্রাম করুন। এই একটি টাকা নিন খরচ করবেন।

আমি। আমার টাকায় দরকার কি? আমি নেব না, আর কাওকে দেবেন।

ষ্টে মাঃ। আপনার মত টাকা ছেড়ে দিতে আর কাউকে আজ পর্য্যন্ত দেখিনি।

আমি। আমার যখন আবশ্যক নেই, তখন আমি নিয়ে কি করব!

সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমে গিয়ে একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে রইলাম, যথাসময়ে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। গাড়ী থেকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিবের আদরের কাশী দেখতে যে কি সুন্দর তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন।

আমার মন মোহিত হয়ে গেল। এর আগে আমার ভাগ্যে কাশী যাওয়া ঘটে নি। রাজঘাটে যথাসময়ে নামলাম, এখানে কেউ টিকিট চাইলে না। বাইরে এসে মনে মনে স্থির করলাম, আগে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করে তবে অন্য কোথাও যাব।

সপ্তদশ অঙ্ক

পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন পথে গেলে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়া যায়? সে আমায় সোজা যেতে বল্লে। আমি তার নির্দ্দেশমত বরাবর গিয়ে, একটি গলির ভেতর ঢুকে সুমুখেই সিঁদুর মাখান গণেশ দাদাকে দেখে, বিশ্বনাথের সোণার মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম। আগে ভেবেছিলাম, বিশ্বনাথ হাত পাওয়ালা, ওমা তা নয়, কষ্টি পাথরের লিঙ্গ, যা হোক তাঁর মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে, বেরিয়ে এসে অন্নপূর্ণা দর্শণ করলাম। সেখানে একটু বসে বেরুচ্ছি সুমুখে দেখি মা—আমার গর্ভধারিণী মন্দিরে ঢুকছেন। আমায় দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে খানিক একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি মনে মনে হাসছি, আমায় ভাল রকম চিনতে পারছেন না। সহসা কথা বলতেও পারছেন না। পারবেনই বা কি করে, আমার একমুখ লম্বা দাড়ি, মাথায় বড় বড় চুল, কতক তার জট পাকিয়েছে, সে সময় একহারা ছিলাম, এখন বেশ নাদুস নদুস চেহারা হয়েছে, রংটাও আগেকার চেয়ে ফরসা হয়েছে, কাজেই ফস্ করে চেনা শক্ত। তবে মার ছেলেকে

মা দেখলেই কেমন স্নেহ যেন বলে দেয় এই যে তোমার ছেলে। মা ধরা গলায় ছলছলে চোখে আমায় বল্লেন "বাবা, যদি কিছু মনে না কর তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, একবার এই দিকে এস।" তাঁর সঙ্গে আবার মন্দিরের মধ্যে গিয়ে এক পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ের ধূলা নেবা মাত্র ফুকরে কেঁদে উঠে হাতের সাজি আর ঘটিটা শুদ্ধ আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন "এতদিন এমন করে কি আবাগী মাকে ভুলে থাকৃতে হয় বাবা! আমাকে কাঁদিয়ে কি তোর ধর্ম্মকর্ম্ম হবে, চ অরে চ।"

আমি। অন্নপূর্ণা দর্শন করে এস, তার পর তোমার সঙ্গে যাব।

মা। না আমি আর অন্নপূর্ণা দর্শন করতে যাব না। আমি গেলে তুই পালাবি।

আমি। মা—আমার জন্যে অন্নপূর্ণা দর্শন করা ত্যাগ কর না। আমি তোমার পরকালে কাজ দোব না। তুমি যাও দর্শন করে এস, আমি পালাব না! বাবা কোথায়?

মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন "এইখানেই আছেন। তাঁর যা অবস্থা হয়েচে দেখবি চ।"

আমি অনেক জেদাজেদি করায়, আমায় সঙ্গে নিয়ে অন্নপূর্ণার ঘরে ঢুকে তখনি বেরিয়ে এলেন। বাহিরে আসতে অন্নপূর্ণার প্রধান পাণ্ডা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মাই, বাবাকে ধরে রয়েছ কেন?"

মা। পালাবার ভয়ে। এ আমাদের হারানিধি, আজ বারবৎসর আমাদের ছেড়ে পালিয়েছিল, মা অন্নপূর্ণা আজ দয়া করে মিলিয়ে দিয়েছেন।

পাণ্ডা। মাই, তোমার অদেষ্ট খুব ভাল। এমন মহাপুরুষকে গর্ভে ধরেছিলে। এঁকে সাক্ষাৎ শিব বলে ভ্রম হয়। আমার পায়ের ধূল নিয়ে বল্লেন "বাবা, আপনার আশ্রম কোথায় ?"

পাণ্ডা যখন আমার পায়ে হাত দিয়েছিল মা হাঁ হাঁ করে বারণ করতে করতে বল্লেন "ওর অমঙ্গল হবে।"

পাণ্ডা হেসে বল্লে "ওঁর কিছু হবে না, আমাদের লাভ হবে, আমরা উদ্ধার হয়ে যাব।" এমনি মাতৃস্নেহ।

আমি। সর্ব্বত্র।

পাণ্ডা নমস্কার করে বল্লেন "মাই, বাবাকে ধরে রেখ, আজ বিকেলে আমি তোমার বাড়ী যাব।"

আমি মার সঙ্গে বাঙ্গালীটোলায় একটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। মা উঠন থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন "ওগো, দেখ গো কাকে ধরে এনেছি।" বাবা ওপর থেকেই বল্লেন, "উপরে এস তবে ত দেখব,—আমার কি উত্থান শক্তি আছে।" আমরা উপরে গেলাম। বাবা একখানি সতরঞ্চির উপর বসে আছেন, তার সে চেহারা নেই, রোগা হয়ে গেছেন, মুখখানি মলিন। আমি প্রণাম করবামাত্র নারায়ণ বলে আমার হাত ধরে বল্লেন, "বাবা! আপনি আমায় প্রণাম করবেন না, আমি বড় পাপী।"

মা। চিনতে পারছ না—আমাদের হাবলা।

বাবা, "তাই বলে আমায় অন্য সন্ন্যাসী প্রণাম করবে কেন ?" বলে আমায় জড়িয়ে বুকে করে অনেকক্ষণ থেকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন "আঃ বুকটা এত দিনে জুড়ল। কোথায় ছিলি বাবা, এমন করে কি কাঁদাতে হয় ?" আমি চুপ করে রইলাম। তাঁর পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার কি অসুখ হয়েছে ?"

বাবা। একখানি কি বাবা, যে বলব, সতেরখানা ধরেছে।

আমি। কি হয়েছে বলুন না, যদি বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কিছু করতে পারি।

বাবা। তোমার ডাক্তারী চিকিৎসায় কিছুই ফল পাইনি। কবরেজী ধরেছি, এখন তাই চলছে, কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না। মনের ব্যাধি না সারলে, অন্য রোগ কি সারে। তোমার ভাবনায় আরো জখম করেছিল। তার পর দীনবন্ধুর ব্যাভারে আমাদের দেশ ছাড়া করেছে। রোগ কত রকম শুনবে—বদহজম, বাত, পেচ্ছাবের ব্যারাম, পেটের অসুখ, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, কোনটার চিকিৎসা করবে বাবা?

আমি। আপনি ভাববেন না, সমস্ত অসুখ আমি দুদিনে ভাল করব। দাদা কি করেছেন যে আপনাদের দেশত্যাগী হতে হয়েছে?

বাবা। আর সে কথায় কাজ নেই। যেখানে থাকুক বেঁচে থাক, পিতামহের নাম থাকবে। তুমি ত বিয়ে করে সংসারী হবে না, আর হবেও না।

মা আমায় হাত মুখ ধুতে বল্লেন, আমি ধুয়ে এলে, একখানা কাপড় পরতে দিলেন। আমি বল্লাম "মা আর কাপড় পরব না, বনে নেংটা থাকতাম। না হয় একটু ছেঁড়া নেকড়া দাও কপনী করি।" তিনি কাঁদতে লাগলেন। বাবা বল্লেন "ও ঘরে আর থাকছে না, যে কদিন আছে যা বলে শোন।" মা খাবার দিলেন খাচ্ছি, পাড়ার লোক একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, আমাকে কেও কেও বললে, "আহা, এমন ছেলে, কি দুঃখে সন্ন্যাসী হয়েছে। আমি ঘরের বাইরে আসবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "কোথা যাচ্ছিস?"

আমি। গোটা কতক পয়সা দাও, বাবার জন্তে ওষুধ নিয়ে আসি।

মা। তুই আবার পালাবি।

আমি। সত্যি বলছি এখন পালাব না। বাবাকে ভাল না করে কোথাও যাব না।

মা। সত্যি করছিস?

আমি। তোমার কাছে কি মিথ্যে বল্‌তে পারি মা না কখন বলেছি।

মা আমায় একটি টাকা দিলেন। আমি বাজার থেকে ওষুধ কিনে এনে তৈরি করে তখুনি খাওলাম আর অন্যান্য ওষুধ সব বন্ধ করে দিলাম।

সন্ধ্যের পর অন্নপূর্ণার পাণ্ডা এসে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল, আমি কোথায় কোথায় গিছলাম, কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছি জিজ্ঞাসা কর্‌লে। আমি বনের পাহাড়ের সন্ন্যাসীদের কথা বল্লাম। শুনে খুব খুসী হয়ে আমার কাছ থেকে দু একটি ওষুধ শিখে প্রায় রাত্তির বারটার সময় বাড়ী গেল। আমি মার কোলের কাছে শুলাম। শুয়ে মা দাদার ও বৌদিদির ব্যবহারের কথা সব বল্লেন, শেষে বল্‌লেন "যে ক'দিন আমরা বেঁচে থাকি কোথাও যাস্ না। আমি কোন উত্তর দিলাম না, তিনি মনে করলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তার পর দিন বাবা বল্‌লেন, "তোমার ওষুধ ম্যাজিকের মত কাজ করেছে।" একদিনেই আমি বেশ উপকার বোধ করছি। রাত্তিরে একবারও পেচ্ছাব করতে হয় নি। বাতের ব্যথা খুব কমে গেছে, সকালেই ক্ষীদে বোধ হচ্ছে। বোধ হয় উপকার হবে।"

আমি। নিশ্চয় উপকার হবে, কাল আপনি উঠে বেড়াতে পারবেন। আর আপনার এ সব রোগ জন্মে হবে না।

দিন পনের বেশ কাট্‌ল, তার পর মন ছটফট করতে লাগল। বাবাও বেশ সেরে উঠেছেন, আর কোন অসুখ নেই। সকাল সন্ধ্যে গঙ্গার ধারে বেড়াতে লাগলেন; চেহারাও বেশ ফিরতে লাগল। একদিন মাকে বল্‌লাম দিন কতকের জন্তে প্রয়াগে যাব। মা কাঁদতে লাগ্‌ল। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন "ফিরবে ত?"

আমি। তা বলতে পারি না। গুরুদেব যেমন আদেশ করবেন তাই করব।

বাবা। তা হলে মরবার সময়ও দেখা হবে না।

আমি। তা কি বলা যায়? হয়ত আসতে পারি।

মা। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি আর তোকে যেতে দোব না।

আমি। আমি মা সৎকাজের জন্তে যাচ্ছি, বাধা দিও না। যদি হাসি মুখে যেতে না দাও পালিয়ে যাব। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

মা খুব কাঁদলেন, একটু স্থির, শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কবে যাবি?"

আমি। দু এক দিনের মধ্যেই যেতে হবে, কেন না পূর্ণিমের সময় ঠাকুর আসবেন।

মা। পূর্ণিমে ত এখনও দেরী আছে।

আমি। আর দেরী কই মা? আজ দশমী, আমি ত্রয়োদশীর দিন বেরুব।

ত্রয়োদশীর দিন খাওয়া দাওয়া করে বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম। মা তখন বাড়ী ছিলেন না, পাড়ার একটি বিধবার একমাত্র ছেলের জ্বর বিকার হয়েছিল। আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে তাদের দিতে গেছ-

লেন। বাবা আমায় পাঁচটি টাকা দিতে চাইলেন, আমি নিলাম না, বল্লাম "আমার দরকার কি ?"

বাবা। গাড়ী-ভাড়া দিতে হবে ত ?

আমি। আমরা টাকা কোথায় পাব যে গাড়ী-ভাড়া দোব। ষ্টেশনের লোকেরা আমাদের ধরে না।

বাবা। তুমি নিয়ে যাও, দরকার হতে পারে। আমার কথা শোন।

আমি আর কিছু না বলে তিনটি টাকা নিয়ে দুর্গা শ্রীহরি বলে যাত্রা করলাম। পথে যাবার মুখে একবার বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করলাম। অন্নপূর্ণার মন্দির থেকে বাইরে বেরুচ্ছি, পাণ্ডার সঙ্গে দেখা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন "বাবা কি কোথাও যাবেন ?"

আমি। প্রয়াগে যাব। এখান থেকে প্রয়াগের ভাড়া কত বলতে পার ?

পাণ্ডা। ঠিক বলতে পারলাম না, বোধ হয় দু টাকার মধ্যে। মা যে বড় ছেড়ে দিলেন ?

আমি। মাকে বলে আসি নি।

পাণ্ডা। তা হলে দেখতে না পেয়ে খুব কাঁদবেন।

আমি। কি করব, আমার যে সংসারের গণ্ডগোল ভাল লাগে না।

বরাবর ষ্টেশনে এসে একখানা টিকিট কিনলাম। বাকী যা রইল বাইরে এসে ভিকিরীদের দিয়ে গাড়ী আসবামাত্র গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

অষ্টাদশ অঙ্ক।

রাত্তিরে নেমে ধর্ম্মশালায় রইলাম। ইচ্ছে রাত্তিরটা সেখানে কাটিয়ে সকালে ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে আস্তানা পাড়ব। ধর্ম্মশালার রক্ষক যত্ন করে আমায় একটি ঘর খালি করে দিলে। ত্রিবেণী স্নান করবার জন্যে এত লোক এসেছে, যে ধর্ম্মশালায় জায়গা পাওয়া দুরূহ। ধর্ম্মশালার রক্ষক একখানা কম্বল এনে পেতে দিয়ে, আমার কাছে বসে সন্ধ্যে করতে লাগল। নানা রকম কথার পর বল্লে "বাবা, আমার অর্শের ব্যারাম হয়েছে, কিসে ভাল হয়?" আমি তাকে ডাক্তার দেখাতে বল্লাম, কিন্তু সে বল্লে তার পয়সা নেই, ডাক্তার টাকা চায় কোথায় পাবে। পাঁচ টাকা মাইনে পায়, তাতে নিজেদেরই পেটে কুলয় না, ডাক্তারকে কোথা থেকে দেবে। তার কাতরতা দেখে, আমার মনে বড় কষ্ট হল, আমি বল্লাম "আমি তোমায় ওষুধ দোব।" সে আমার জন্যে পোয়াটাক দুধ আর দুটো পেঁপে আনলে। আমিও অম্লানবদনে মুখে দিয়ে, এক ঘটী জল খেলাম। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম "মা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলছেন।" ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাইরে এসে দেখি বেলা হয়েছে; অনেক খুঁজে পেতে ওষুধ পেয়ে তাকে দিয়ে বল্লাম "আমি ত্রিবেণীতে থাকব, তিন দিনের মধ্যে যদি তোমার রোগ না সারে আমায় খবর দিও।" সে পায়ের ধূল নিয়ে মাথায় দিলে। আমি ত্রিবেণীর পথ জেনে নিয়ে সেই পথ ধরলাম।

গঙ্গার ধারে এসে দেখলাম অনেক সাধু সন্ন্যাসী এসে জুড়ে রয়েছেন। দু চারখানি খালিও ছিল, একটি দখল করলাম। কোন ধর্ম্মপরায়ণ

দাতা, সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যে ঐ সমস্ত কুঁড়ে তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। বেলা দশটার সময় একজন ব্রাহ্মণ দুধ, লুচি আর হালুয়া, যাঁরা পাক বা ভিক্ষে করেন না তাঁদের দিয়ে যান। আমার কাছে এসে বল্লে "বাবা, ঠাকুরের ভোগের জন্যে কিছু এনেছি কৃপা করে নিন।" আমি বল্লাম "আমার কাছে পাত্র টাত্র ত নেই কিসে নোব।" সে তখুনি একখানা পেতলের থালায় লুচি আর হালুয়া, আর একটি ঘটিতে আধসের দুধ দিলে। আমি থালা ঘটী কি হবে জিজ্ঞেস করায় সে বল্লে "আপনার কাছে থাক্।"

আমি। তোমার থালা ঘটির জন্যে কিন্তু আমি আবদ্ধ হয়ে থাকৃতে পারব না। আমার ইচ্ছা হলেই চলে যাব।

ব্রাহ্মণ। আপনার যেখানে ইচ্ছে যাবেন। আমাদের লোক সদা সর্ব্বদা এখানে মোতায়েন থাকে, সেই এর জন্যে দায়ী।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

চতুর্দ্দশীর দিন বৃষ্টি নামল। একে গঙ্গার ধার তায় খোলা কুঁড়ে, শীতে হাড় ভেঙ্গে দিতে লাগল। বিকেলে একজন একটা গুঁড়ি এনে ধুনী জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ধুনী জ্বলে উঠতে শীত অনেক কম বোধ হল। পূর্ণিমার সকাল থেকেই বৃষ্টি ধরে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, কত দেশের লোক যে পুণ্যসঞ্চয় করবার জন্যে এসেছিল তা বলা যায় না। দুপুর বেলায় বসে আছি, একটি ভৈরবী আমার কুঁড়ের মধ্যে এসে আমায় প্রণাম করে বসল। তাকে দেখে মনে হল যেন কোথায় দেখেছি কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না। কিছুতেই মনে হল না, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! তুমি কোথা থেকে আসছ?"

ভৈরবী। বাবা! আমায় চিনতে পার না? আমি ব্রহ্মানন্দের

শিষ্যা, তোমারই জন্যে ঠাকুর আমায় কিছু দিনের জন্যে নির্ব্বাসিত করেছিলেন।

আমি। ওঃ তুমি সেই, তোমার নামটাও মনে পড়ছে না।

ভৈরবী। তখন নাম ছিল লছমী।

আমি। এইবার মনে পড়েছে। তোমার ঠাকুর এসেছেন?

ভৈরবী। তিনি চার বছর সহস্রারে লীন হয়েছেন।

আমি। এখন আশ্রমে কে আছেন?

ভৈরবী। স্বামী বিমলানন্দ, আপনি তাঁকে চেনেন ত?

আমি। তিনি এসেছেন না কি?

ভৈরবী। হ্যাঁ, আমরা ঐ ধারে আছি। যাবেন?

আমি। আপত্তি কি। তোমার মন এখন বেশ বশ হয়েছে ত?

ভৈরবী। আর হবে না? বয়েস হচ্ছে ত। চলুন?

আমি তাদের কুঁড়েয় গেলাম। বিমলানন্দ অভ্যর্থনা করে একখানি মৃগচর্ম্ম বসতে দিলেন। নানারকম গল্পগুজব করে সন্ধ্যা হব হব সময় আমরা কুঁড়েয় ফিরে এলাম।

গোধূলির সময় একজন জ্যোতির্ম্ময়, সৌম্যমূর্ত্তি, সুপুরুষ, শ্বেত শ্মশ্রু, জটাজুটধারী, বিবস্ত্র, সন্ন্যাসী, শিব বলে ভ্রম হয়, আমার কুঁড়ের সুমুখে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়িয়ে আমায় দেখে, বরাবর গঙ্গার ধারে গিয়ে, তিনবার গঙ্গাজল স্পর্শ করে, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেমন আমরা মাটীর ওপর চলি, ত্রিবেণী সঙ্গমে, অর্থাৎ যেখানে ত্রিধারা গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী একত্র সম্মিলিত হয়েছেন, তিনটি ডুব দিয়ে, আবার সেই রকম হেঁটে ওপরে উঠে, আমার কুঁড়ের সুমুখে এসে "বেটা, গাঁজা পিলাও।" তাঁকে দেখে অবধি আমার বুকের ভেতর

টিপ্ টিপ্ করছিল। শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। আমি দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বল্লাম "বাবা, আমার কাছে ত গাঁজা নেই।" তিনি ভ্রূকুটী করে জলদগম্ভীর স্বরে আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে দেখিয়ে বল্লেন "আরে কমবখত দেখ, তেরা পিছনে হ্যায়।" পেছন ফিরে দেখলাম সত্যিই একখানা পাতার ওপর গাঁজা, দোক্তা, কল্কে আর একখানা টিকে ধরান রয়েছে। আমি সমস্ত তুলে সুমুখে রেখে গাঁজা বাছতে বাছতে ভাবছি কে এ সব এখানে রেখে গেল? এর আগে ত ছিল না। সন্ন্যাসী বালির ওপর বসে জটা খুলে জল ঝাড়তে ঝাড়তে মুচকে মুচকে হাসছিলেন। গাঁজা তৈরী করে তাঁর হাতে দিতেই সাঁকি চাইলেন। আমার কাছেই এক টুক্‌রা ভিজে নতুন ন্যাকড়া পড়ে ছিল কুড়িয়ে দিলাম। তিনি "আলক" বলে গাঁজায় একটি টান দিয়ে কল্কে মাটীতে রেখে উত্তর মুখে চলে গেলেন। আমার সে দিন গাঁজা খাবার সখ্ হওয়ায় কল্কেটা তুলে টানলাম কিন্তু ধোঁয়া বেরল না। বার দুই খুব জোরে জোরে টানলাম তবুও ধোঁয়া বেরল না। মনে করলাম, আগুন নিবে গেছে, দেখলাম কই না, আগুন গণ গণ করছে। ফের খুব জোরে টানলাম, কিছুই না। রেগে ঢেলে ফেললাম, ঢেলে অবাক হয়ে গালে হাত দিলাম। ছাই-য়ের পরিবর্ত্তে যেটুকু গাঁজা সেজে দিয়েছিলাম, সেটুকু সোণা হয়ে গেছে; ভাবছি—যাঁর টানে গাঁজা সোণা হয়, না জানি তিনি কত বড় মহাপুরুষ।

আমি এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে কখন কালিকানন্দ এসে দাঁড়িয়েছিলেন দেখতে পাইনি; যখন তিনি বল্লেন "অত কিসের গভীর চিন্তা ভায়া!" তখন আমার চমক ভাঙ্গল। আমি তাঁকে বসতে বলে

বল্লাম, ভাবছি কি জান, একজন মহাপুরুষ গঙ্গার জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ত্রিবেণীতে চান করে এসে গাঁজা খেতে চাইলেন। জান ত আমার পুঁজি পাটা কিছুই নেই। নিজে ত খাই না, কাজেই রাখি নি; বল্লাম কোথায় পাব, তিনি বল্লেন তোর পেছনে দেখ দেখি, সত্যি সব সরঞ্জাম রয়েছে। এমন কি টিকেটি পর্য্যন্ত ধরান। তয়ের করে কল্কেট হাতে দেবামাত্র একটি টান দিয়ে কল্কে নামিয়ে রেখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলেন। আমার কেমন খাবার ইচ্ছে হল, টানলাম, ওমা কিছুই নেই। রাগ করে ঢেলে ফেল্লাম, ছাইয়ের বদলে সোণা, তাই ভাবছিলাম, কে এ মহাপুরুষ, ইনি ত বড় কেও কেটা নন, একজন মহাপুরুষ। এই দেখ না পড়ে আছে।

কালিকানন্দ হাসতে হাসতে বল্লেন ভায়া এটুকু বুদ্ধিতে যোগান না, যে আমাদের বাবা ভিন্ন জগতে আর কার এমন ক্ষমতা আছে?

আমি একেবারে লাফিয়ে উঠে, গালে মুখে চড়িয়ে বল্লাম বল কি —তা হলে ত আমায় খুব বোকা বানিয়ে গেছেন?"

কালি। তার অপরাধ কি? তুমি ত তাঁকে দু তিনবার দেখেছিলে, তবুও ত চিনতে পারলে না।

আমি। কবে দেখেছি, তিনি ত বরাবরই লুকোচুরি খেলছেন।

কালি। প্রথম ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে। দ্বিতীয়বার পূর্ণিমেশ্বর শিবের পথে। তৃতীয়বার পূর্ণিমেশ্বর শিব দর্শন করে ফিরে আসার পথে। এতেও যদি ভাই চিনতে না পার ত কার অপরাধ?

আমি। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম, মনে এত দুঃখ হয়েছিল যে দূর হোক আর এ প্রাণ রাখব না। শেষে বল্লাম "আমি কিছুই বুঝতে

পারি নি। এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, আর ভুলব না। কি হবে—আর কি দেখা পাব না?

কালি। হতাশ হয়ো না, এখন তিন দিন ঠিক এই সময়ে আসবেন। ধরলেই কাজ হবে।

আমি। যদি না আসেন, কি হবে?

কালি। নিশ্চয় আসবেন, তোমার সময় হয়েছে, তিনি কি আর না এসে থাকতে পারেন? যদি গাল মন্দ দিয়ে তাড়াবার ফিকির করেন, খবরদার ছেড় না যেন?

আমি। এবার একবার দেখতে পেলে হয়।

কালি। নিশ্চয় পাবে, এখন আমি আসি, কাল আবার দেখা হবে।

আমি। বিমলানন্দ সশিষ্য এসেছেন?

কালি। কি জানি—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?

আমি। তাঁর এক শিষ্য আমায় নিয়ে গেল।

কালি। তাদের কি বাবার কথা বলেছ?

আমি। না।

কালিকানন্দ "বেশ করেছ, তাদের বলবার দরকার নেই। তবে এখন আসি" বলে যেন উপে গেলেন। আমি হাঁ করে বসে রইলাম।

তারপর দিন ঠিক সেই গোধূলির সময় সেই মহাপুরুষ আমার কুঁড়ের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। কোথা থেকে কেমন করে যে সেখানে এলেন বুঝতে পারলাম না, কেন না আমি তাঁর অপেক্ষাতেই বাইরে বসে চারিদিকে লক্ষ্য করছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম, তিনি একটু হেসে গঙ্গার তীরে গেলেন। পূর্ব্বদিনের মত তিনবার গঙ্গাজল স্পর্শ করে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ত্রিবেণী-সঙ্গমে

তিনটি ডুব দিয়ে ফিরে এসে "গাঁজা পিলাও বেটা" বলে বসলেন। আমি আগে থেকেই গাঁজা তৈয়েরী করে রেখেছিলাম, বলবামাত্র আগুন দিয়ে তাঁকে দিলাম। তিনি "অনেক" বলে দম মেরে কল্কে রেখে উঠে উত্তর দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম, কালবিলম্ব না করে তাঁর পেছনে পেছনে ধাওয়া করলাম। খানিকদূর গিয়ে পেছন ফিরে আমায় দেখতে পেয়ে বললেন "কাঁহা আতা হ্যায় ?"

আমি। আর ভোগাচ্ছেন কেন বাবা ? আমায় উদ্ধার করুন।

তিনি চোখ মুখ লাল করে রাগ করে চেঁচিয়ে "কমবখত" বলে সেই-খানে একটা পচা মড়া পড়েছিল, তার হাতটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে মারবার জন্মে তুললেন, সেটা আমার ঘাড়ে পড়বার আগেই আমি তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলাম।

মড়ার হাতটা ফেলে দিয়ে আমার হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে নিলেন "আজ চল্লিশ বছর পরে তোকে কোলে করলাম, আয় মন্ত্র দি।"

সেইখানে বসে কিছুক্ষণ চোক বুজে থেকে আমার কানে ফুঁ দিলেন অর্থাৎ দীক্ষিত করে, কতকগুলি উপদেশ দিয়ে অন্তর্দ্ধান হলেন।

আমি নবজীবন লাভ করে, প্রফুল্লিত মনে গুণ গুণ করে গান করতে করতে যখন কুঁড়েয় ফিরে এলাম তখন রাত হয়েছে। কুঁড়েয় ঢুকে দেখলাম কালিকানন্দ বসে আছেন।

কালি। কেমন ভায়া কেল্লা ফতে ?

আমি তাঁর পায়ের ধূল নিয়ে বল্লাম "আপনার আশীর্ব্বাদে এতদিন পরে আজ আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে পারি।"

কালি। বড় বেশী খাট্‌তে হবে না, অনেক এগিয়ে আছে।

আমি। কি এগিয়ে আছে, বুঝতে পারলাম না।

কালি। খাটা।

আমি। আমি ত একটুও খাটিনি।

কালি। আরে ভায়া একবার নয়, গতবারে অনেক করে রেখেছ।

আমি। গত জন্মে করেছি, সে ত মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচে গেছে।

কালি। কে বল্লে তোমায়, তা যায় না, জগতে সব শেষ হয়, শেষ ঐটের নেই। আর মনে যতটুকু করেছ এবার সেটুকু আপনা আপনি ফস্ করে আয়ত্ত হবে। সে তুমি আপনি বুঝতে পারবে, যখন নতুন ক্রিয়া করবে তখনই একটু সময় লাগবে। তা সপ্তম ঠাকুরের কৃপায় তুমি নিজের উন্নতি করবে। এখন তুমি কোথায় যাবে?

আমি। কালও এখানে থাকব, ঠাকুর আসবেন ত তাঁর সঙ্গে দেখা করে, তারপর একবার কাশী যাব, সেখানে মার কাছে কিছুদিন থেকে ভবানীপুরে জন্মভূমি মাড়িয়ে কামিখ্যা যাব। ঠাকুর ত সেখানে থাম-বেন বলেছেন।

কালি। আমিও যাব মনে করছি। আর ত তোমায় আগলে আগলে বেড়াতে হবে না, তোমার ভার এখন তাঁর ওপর, আমি নিশ্চিন্দি হয়ে এখন একটু থাকতে পারব।

আমি। তা কি হয় দাদা। নিশ্চিন্দি বললে কে শুনছে, কালও ত আসবেন?

কালি। হ্যাঁ, কালও একবার আসতে হবে। বিমলানন্দ ধরেছে, একবার ঠাকুরকে দেখবে। সেই জন্যে আসতে হবে। না হলেও, শেষ দিনটা আর বাদ দি কেন?

আমি। কাল আপনাদের জন্যে কিছু খাবার আয়োজন করব।

কালি। ও সব হ্যাঙ্গাম কেন? পয়সা পাবে কোথা?

আমি সেই সোনা দুটো দেখিয়ে বল্লাম, "পয়সার অভাব বাবা ত রাখেন নি।"

আমার এই ইচ্ছে হবে বলে আগে থেকে যোগাড় করে দিয়েছেন।

কালি। তা সত্যি, তবে এখন আমি আসি। হ্যাঁ--যদি খাবার আয়োজন কর, তা হলে বোতল কতক কারণ ভুল না।

আমি। মাছ, মাংসও ত যোগাড় করতে হবে?

কালি। পারলে ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই।

কালিকানন্দ অন্তর্ধান হলেন। আমিও এক ছিলিম গাঁজা টেনে শুলাম।

প্রাতঃকালে উঠে বিমলার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিমন্ত্রণ করলাম। সে আমায় বল্লে, "গুরুদেব বলেছেন আজ পরমগুরুর শ্রীচরণ দর্শন করাবেন।"

আমি। আমাকেও কাল বলছিলেন, তাই মনে করেছি আজ কিছু খাবার দাবার আয়োজন করব।

চল না একবার বাজারে যাই, সমস্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসি।

বিমলা। চলুন যাই, আরো দু একজনকে সঙ্গে নোব?

আমি। বেশ ত নাও।

আমরা চারজনে বরাবর বাজারে এসে, একটি সেকরার দোকানে তেইশ টাকায় সোণা দু টুকরা বেচে, ঘি ময়দা, চিনি, দধি ইত্যাদি কিনলাম। দাঁড়িয়ে ভাবছি আমাদের মাছ মাংস, আর কারণ কেনা যুক্তিযুক্ত নয়, কি উপায় করি। বিমলানন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করলে কি ভাবছি?

আমি তাকে আমার মনের ভাব বল্লাম, সেও একটু চিন্তিত হল। এমন সময় একটি বাঙ্গালী বাবু আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখে চিনতে পারলাম। ইনি দানাপুরে রেলওয়ে আফিসে চাকরী করতেন, আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁকেও গোপাল বাবু বলে ডাকতেই থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলেন। কে ডাকলে বুঝতে পারলেন না। আমরা অপরিচিত সন্ন্যাসী যে তাঁকে ডাকব, এ কথাও তিনি ভাবতে পারেন নি। যা হোক, তাঁর ঐ রকম ভাব দেখে আমার বড় হাসি পেয়েছিল। তাঁকে আর বেশীক্ষণ অন্ধকারে রাখতে মনে কষ্ট হয়েছিল, বল্লাম "গোপাল বাবু, আমি" ডেকেছি।" তিনি আমাদের কাছে এসে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন "কি আদেশ আছে, বলুন। আমার নাম আপনি জানলেন কেমন করে?

আমি। আমায় চিনতে পারছ না?

সে অনেকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে, "না, বাবা—মনে করতে পারলাম না।"

আমি। দানাপুরের জগৎবন্ধু ডাক্তারকে মনে আছে? আমি সেই।

সে খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে থেকে বল্লে "এইবার মনে পড়েছে। চেনবার যো কি, সে চেহারা ত নেই। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছেন, লম্বা দাড়ি, মাথায় বড় জটা, কার সাধ্যি ফস্ করে চেনে। ভাল আছেন?"

আমি। বেশ আছি ভাই, তোমার সব ভাল?

গোপাল। আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম কেটে যাচ্ছে। কুম্ভস্নান করতে এসেছিলেন বুঝি?

আমি। হ্যাঁ। তোমায় আমার একটি কাজ করতে হবে?

গোপাল। কি বলুন?

আমি। আমায় তিন সের মাছ, তিন সের মাংস, আর একটা কলসী করে পাঁচ বোতল কি দু বোতল মদ কিনে দিতে হবে।

গোপাল। তা বেশ দিচ্ছি। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমার সঙ্গে অত টাকা নেই, বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।

আমি। টাকা আমি দিচ্চি। তোমার বাড়ী কতদূরে ?

গোপাল। বেশী নয়, ঐ মোড়ের ধারেই। চলুন না সেখানে বস-বেন, তার পর আমি সব কিনে কেটে নিয়ে যাব।

আমি "সেই ভায়া, চল, এস হে," বলে তার বাড়ী গিয়ে বসলাম, সে টাকা নিয়ে বাজার করতে চলে গেল। তার বাড়ীর ছেলেপিলেরা এসে আমাদের কাছে বসল। একটি ছেলে জীর্ণ শীর্ণ যেন কতকালের রোগী। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার কি অসুখ হয়েছিল, সে ঘাড় নাড়লে। গোপাল সমস্ত কিনে ফিরে এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "এটি কি তোমার ছেলে, ওর কি হয়েছে ?"

গোপাল। ও আজ দু বছর থেকে ভুগছে, ডাক্তার কবরেজ দেখিয়ে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছি, কিছুতেই ভাল হল না। এখন ভগবানের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

আমি। কাল আমি একটা ওষুধ দোব, খাইয়ে দেখ ভাল হয়ে যাবে।

গোপাল। তা হলে আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

আমি। গোলাম টেক্কা কিছুই হতে হবে না, ওকে আমি ভাল করে দোব। তোমায় আর একটি ব্যাগার দিতে হবে। আমার এই মাছ মাংসগুলি রাঁধিয়ে দিতে হবে, সন্ধ্যের আগে আমার একজন লোক আসবে তাকে দিও। কেমন হবে ত ?

গোপাল। নিশ্চয় হবে, কোথায় পৌঁছে দিতে হবে জানতে পারলে আমিই না হয় দিয়ে আসতাম।

আমি। আমি গঙ্গার ধারে একটা কুঁড়েয় আছি, তুমি কত খুঁজবে, আমি কাউকে পাঠিয়ে দোব খন।

গোপাল। যা ভাল বোঝেন করবেন।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে কুঁড়েয় এলাম। বিমলানন্দকে বললাম, এখন এগুলো তোয়ের করবার কি হবে?

বিমলা। তার জন্যে ভাবতে হবে না। ভুতে করে ফেলবে। আপনি বসুন, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।

সে তার চার পাঁচজন শিষ্যকে লাগিয়ে দিলে, সন্ধ্যের আগে সমস্ত প্রস্তুত হল। লছমী কোমর বেঁধে সব কাজেই যোগাড় দিতে লাগল। তাকে বিমলানন্দ তরকারী রাঁধবার ভার দিয়েছিল।

গোধূলির সময় ঠাকুর আবির্ভাব হয়ে, হাসতে হাসতে বল্লেন "আজ কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্চে হে?"

আমি প্রণাম করে বল্লাম "শিবের সেবার আয়োজন হচ্চে। আজ বাবাকে এখানে থাকতে হবে।" তিনি কোন কথা না বলে চান করতে চলে গেলেন। যে লোককে আমি মাংস আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে গোপালের সঙ্গে ফিরে এল। আমি গোপালকে বল্লাম "কাল সকালে পার ত এস, তোমার ছেলের ওষুধ নিয়ে যেও। না হয় আমিই যাব'খন।"

গোপাল। আমি আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব, তার পর আসব।

আমি। তা হলে আসতে হবে না, আমিই যাব।

গোপাল। আচ্ছা, বৌও আপনাকে দেখতে চেয়েছে।

আমি। বেশ, তা তুমি কেন কষ্ট করে এলে?

গোপাল। এর আর কষ্ট কি, বেড়ান হল। আমি এখন চললাম।

গুরুদেব স্নান করে এলেন, তাঁকে কুঁড়ের ভেতর একখানি মৃগচর্ম্ম পেতে দিলাম, তিনি বসে বল্লেন "জগবন্ধু, গাঁজা তৈয়ার কর।"

আমি একটি শিষ্যকে গাঁজা দিলাম, সে তয়ের করছে, এমন সময় কালিকানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। বিমলানন্দকে ডেকে বল্লেন "বিমল, ইনি আমাদের ভবপারের কাণ্ডারী।" বিমলানন্দ তাঁকে প্রণাম করলেন, ঠাকুর "নারায়ণ" বলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে উঠতে বল্লেন।

আমি সমস্ত খাবার দাবার সাজিয়ে কারণের কলসীটা তাঁর সুমুখে দিলাম। তিনি আনন্দিত হয়ে বল্লেন "জগবন্ধু, এ সব কি করে যোগাড় হল?"

আমি। আপনার কৃপায় কিছু অভাব হয় না। আহা বাবা! এ সব নইলে শুদ্ধাচারে কি সাধনা হয় না?"

ঠাকুর। হবে না কেন, হয়, তবে কলিতে হয় না। শিব নিজে বলেছেন :—

কলিবল্মষদীনানাং দ্বিজাদিনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মনা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্ণৃণাম্ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং মমোচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিপ্রিয়ে।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধিঃ।
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোহমার্গ প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

অতো মগ্নতমুৎসৃজ্য যো মৎকর্ম্ম সমাচরেৎ।
নির্ম্মলঃ শুদ্ধবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ।
মূঢ়োমন্নতমুৎসৃজ্য যোঽন্যন্নতমুপাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীয়ঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু জপযজ্ঞ ক্রিয়াদিষু।
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরসা ইব।
সত্যাদি সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা হব।
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতকর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবী তীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।
নান্যঃ পন্থা মুক্তি হেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গোমোক্ষায় চ সুখায় চ॥

এখন বুঝলে ত যে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন কলিতে অন্য মতে সাধনা করলে সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা, নিরয়গামী হতে হয়।

আমি। সংসারে সকলেই ত যজন যাজন বৈদিকমন্ত্রে করে থাকেন।

ঠাকুর। সেই জন্যে ফলও পাওয়া যায় না। ফল না পেলেই তাতে ভক্তি থাকে না। আমাদের দেশে যে শাস্ত্রে অবিশ্বাস দিন দিন বাড়ছে তার প্রধান কারণই ঐ। বৈদিক মন্ত্র আর বৈদিক কার্য্য শুদ্ধাচারে হওয়া উচিত। কলিতে তা হবার যো নেই; কেন না আমাদের ভারতের বায়ু পর্য্যন্ত ম্লেছ নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে কলুষিত। যাক, তোমায় যেমন উপদেশ দিয়েছি, তুমি সেই রকম কোর, হাতে হাতে ফল পাবে। আর যখন যা ঠেকবে, আমায় স্মরণ করো,

মীমাংসা করে দোব। আমি চল্লাম, আবার কামিক্ষ্যেয় দেখা হবে।

আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম, সকলে প্রণাম করে, মাথা তুলে দেখি কাকস্য পরিবেদনা।

সকালে গোপালের ছেলেকে ওষুধ দিয়ে বিকেলের গাড়ীতে কাশী রওয়ানা হয়ে, রাত্তিরে বাড়ী এসে মা বাবাকে প্রণাম করলাম। নার আনন্দ রাখবার জায়গা ছিল না; মাসাবধি কাশীতে থেকে ভবানীপুর যাত্রা করলাম। এখনও সেই Wild goose hurting করে বেড়াচ্ছি।

সমাপ্ত